সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

স্মৃতিতে বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক নিবেদন

দোয়া ও আলোচনাসভা

১৮ অক্টোবর ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মদিন। এদিন সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠপর্যায়ের শাখাগুলোতে যথাযথ মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিকেলে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২২ ● ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

তুমি যে মহান - ড. নূরুন নাহার বেগম	২
মহাবিশ্বের অতি সান্নিধ্যে - রিয়াজ মাহমুদ	৬
শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে - কাজী বজলুর রহমান	৮
শিশুর শিক্ষা - মাহফুজ সালাম	৯
নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় - আবু কামাল খন্দকার	১১
বাউনবাইরার কতা - মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	১৫
চন্দ্রবিন্দুর উদ্যোগে উদ্দীপনা পুরস্কার	১৭
মুক্তপাঠাগার - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম	১৮
রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষাসুপারভাইজারদেরকে পুরস্কার	২০
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে বই উপহার	২১
নতুন ৩টি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার	২২
গুঞ্জন পাঠাগার - শাহেরীন আরাফাত	২৩
দুবাই ভ্রমণ - রাবেয়া নাজনীন	২৫
সফলতার গল্প - কিশোর কুমার	২৬
বিজয়োৎসব-২০২২	২৮
সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার	২৯
বই-আলোচনা: গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা - ফজলুল বারি	৩১

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের স্কেচ
শিল্পী শিশির মল্লিক

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

শিক্ষালোকের সীমিত সাধ্যের মধ্যে ২০১৯এর শুরুর দিকে আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে প্রচ্ছদসহ একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। এবারেও বাংলাদেশের গর্ব এই মহান বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি চমৎকার লেখা ও তাঁকে নিয়েই প্রচ্ছদ। এবারের লেখাটি তাঁর এক সহকর্মীর স্মৃতিচারণামূলক। যে লেখাটির মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু দিক ও গভীর মানবিকতার এক ছবি ফুটে উঠেছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের স্মরণ করার ধারাবাহিকতায় আমাদের এ আয়োজন।

স্কুল থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং এভাবে জ্ঞানপিপাসু নতুন প্রজন্ম ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে সিদীপের নতুন উদ্যোগ 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' গড়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় এ পর্যন্ত ১৫টি মুক্তপাঠাগার তৈরি হয়েছে, আগামী বছর আরও হবে। আমাদের এ নতুন স্বপ্নের প্রতিফলন আছে শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যায়ও। সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা আমাদেরকে তৃণমূল পর্যায়ে পাঠাগার ছড়িয়ে দেয়ার অভিযানে আশাবাদী করে তুলেছে।

শিক্ষার নানাদিক নিয়ে আলোচনা এসেছে বিভিন্নজনের লেখায়। এসেছে সামাজিক সংগঠন, পাঠাগার ও সমাজকর্মের কথা, সিদীপের বিভিন্নমুখী কাজের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিদীপের নানা ধরনের কাজের প্রতিফলনসহ চলতি সংখ্যাটি বৈচিত্র্যময়। জানার ও ভাল লাগার অনেক বিষয় আছে বলে আমার বিশ্বাস।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

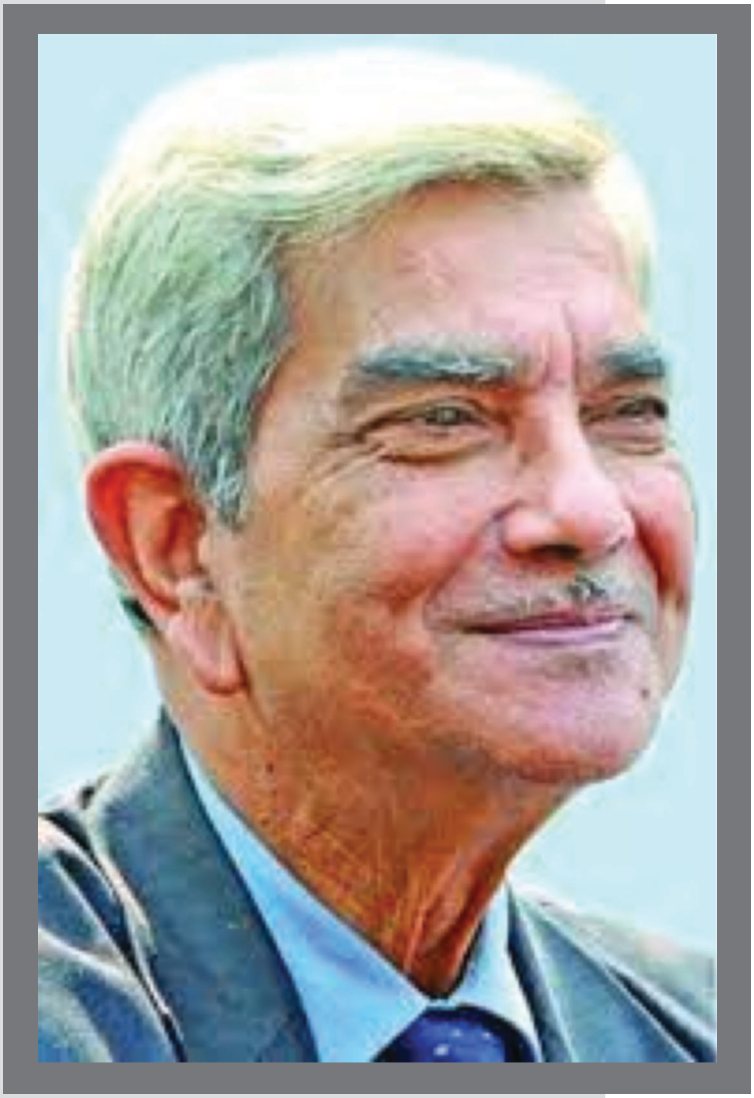

স্মৃতিতে বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম
(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ - ১৬ মার্চ ২০১৩)

তুমি যে মহান

ড. নূরুন নাহার বেগম

বিদেশী বেশভূষায় মোড়ানো এই কীর্তিমান মানুষটি ছিলেন ভীষণ সহজ, সাধারণ, অত্যন্ত লাজুক ও বিনয়ী। "দ্যা টলার দ্যা বেম্বো গ্রোজ দ্যা লোয়ার ইট বেন্ডস।" "বাঁশ যত উঁচু হবে তার মাথা তত নীচের দিকে ঝুঁকে আসবে।" ইংরেজি এই প্রবাদ বাক্যের সফল রূপটি হলেন জামাল স্যার।

প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম স্যার প্রফেসর ডিরাকের ছাত্র ছিলেন বলে প্রায়ই খুব গর্ববোধ করতেন। আমিও প্রফেসর জামাল স্যারের ছাত্রী হিসাবে গর্ববোধ করি। দেশের কৃতি সন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রফেসর ইমেরেটাস জামাল নজরুল ইসলাম স্যার ১৯৮১ সালে প্রথম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে যোগদান করেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। আমার সৌভাগ্য আমি তখন গণিত বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী। স্যার আমাদের ক্লাস নিতেন Relativity ১০০ মার্কের উপর। এই মজার স্যার সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়।

জামাল নজরুল ইসলাম স্যার ১৯৩৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তখন এই শহরের মুন্সেফ (বর্তমানে সহকারী জজের সমতুল্য) ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১ বছর তখনই তাঁর বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে যান। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তিনি কলকাতা মডেল স্কুলে পড়াশুনার পর চট্টগ্রাম চলে আসেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ডাবল প্রমোশন দিয়ে সরাসরি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে নেয়া হয়। সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। সেখানে ভর্তি হন লরেন্স কলেজে। সেখানেই তিনি সিনিয়র ও হায়ার সিনিয়র ক্যামব্রিজ পাশ করেন (বর্তমানে যা 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল বুঝায়)। ১৯৫৭ সালে তিনি লন্ডনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। ক্যামব্রিজে প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যা থেকে ১৯৫৯ সালে ট্রাইপোজ পার্ট-২ এবং ১৯৬০ সালে ডিসটিন্‌কশন নিয়ে ট্রাইপোজ পার্ট-৩ লাভ করেন। সেখান থেকেই ১৯৬০ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২তে ডি.এসসি (ডক্টর অফ সায়েন্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালে তিনি এক বৎসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। সেখানেই আমার সৌভাগ্য হয় স্যারের সংস্পর্শে আসার। এক বছর অনেক কাছে থেকে দেখেছি স্যারকে। আমাদের মাস্টার্স ক্লাস রুমের পাশেই ছিল স্যারের বসার রুম। দেখতে স্যার ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। বাঙালী বলে বুঝাই যেত না। বিদেশী বেশভূষায় মোড়ানো এই কীর্তিমান মানুষটি ছিলেন ভীষণ সহজ, সাধারণ, অত্যন্ত লাজুক ও বিনয়ী। "দ্যা টলার দ্যা বেম্বো গ্রোজ দ্যা লোয়ার ইট বেন্ডস।" "বাঁশ যত উঁচু হবে তার মাথা তত নীচের দিকে ঝুঁকে আসবে।" ইংরেজি এই প্রবাদ বাক্যের সফল রূপটি হলেন জামাল স্যার।

ক্লাসের ফাঁকে আমরা কেবলই অপেক্ষা করতাম কখন স্যার বের হবেন আর সালাম দেব। বাংলা তখনও কিছুই বলতে পারতেন না। বের হলেই আমরা স্যারকে সালাম দিতাম আর উত্তরে উনি মুচকি হেসে মাথাটা নেড়ে শুধু বলতেন– "কে...ম...ন আ...ছো।" এটাই ছিল আমাদের জন্য একটা মজা।

তিনি থাকতেন সদাহাস্য মুখে। তাঁর ক্লাস লেকচারগুলো ছিল আকর্ষণীয়। নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণের সুললিত ইংরেজি ছিল তাঁর লেকচারের অন্যতম আকর্ষণ। বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তু তা যত কঠিন হোক অত্যন্ত বোধগম্য ভাষায় তিনি উপস্থাপন করতেন।

চক এবং ব্ল্যাকবোর্ড তাঁর লেকচারের একমাত্র অনুষঙ্গ। মাল্টিমিডিয়া ছিল তাঁর অপছন্দ। গণিতের সমস্ত ক্যালকুলেশন তিনি বোর্ডে কষতেন এবং প্রয়োজনীয় ফিগার অপূর্ব দক্ষতায় আঁকতেন। তিনি নিজে যে ক্যালকুলেটর আর মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন না সে ব্যাপার ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি মাঝেমাঝেই বলতেন "তোমাদের মোবাইলগুলো পুকুরে ফেলে দাও।" দুঃখের ব্যাপার জামাল স্যার ও কম্পিউটারের মাঝে এক ধরনের বিকর্ষণ প্রক্রিয়া কাজ করত। স্যার তাঁর প্রিয় ছোট টাইপরাইটারের উপর নিয়মিতভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।

ছাত্রজীবন থেকেই স্যারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে বিজ্ঞান জগতের বাঘা ছাত্র ও বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে। আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা স্টিফেন হকিং ছিলেন ক্যামব্রিজে তাঁর সমসাময়িক। এককালের শ্রেষ্ঠ দুই পদার্থবিজ্ঞানী ডাইসন ও ফাইনম্যান তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। একইরকম স্নেহপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেলজয়ী জ্যোতিঃপদার্থবিদ চন্দ্রশেখর। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও জীম মার্লিস ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। এসব অনেক গল্প স্যারের মুখে শুনেছি যখন আমি স্যারের সাথে পোস্ট ডক্টরেল গবেষণা করি।

ফটিকছড়ির একটি অত্যন্ত বনেদি পরিবারের সন্তান তিনি। স্যারের প্রিয় স্থান চট্টগ্রাম, বিশেষভাবে সার্সন রোডে পাহাড়ি নিসর্গসমৃদ্ধ পৈত্রিক ত্রিতল আবাসটি।

স্যারের মুখে প্রায়ই শুনেছি এত কাজ করার পরও তিনি নাকি বট গাছের হাজার হাজার শিকড়ের মধ্যে মাত্র একটি শিকড় ছাড়াতে পেরেছেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন তাঁর এই বিদ্যার্জন পরিপূর্ণতা লাভ করবে যদি আরো দশ জনকে শেখানো যায়, সেই সময় মাতৃভূমির আকর্ষণ অনন্য হয়ে উঠে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের যুব সমাজ ও নতুন গবেষকদের মধ্যে গবেষণা করা, বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে হবে উন্নতমানের শিক্ষা ও গবেষণা করার সুযোগ। তাই তিনি ১৯৮১ সালে গণিত বিভাগে এসে দেখে গেলেন এবং প্রস্তুতির ভিত তৈরি করে গেলেন। প্রায় ৩৫ বছরের বিদেশ বাসের ইতি টেনে ১৯৮৪ সালে স্ত্রী সুরাইয়া ইসলাম ও দুই মেয়ে সাদাফ সাজ সিদ্দিকি ও নার্গিস নাজ ইসলামকে নিয়ে স্থায়ীভাবে ফিরে আসেন চট্টগ্রাম। এসেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে পুনরায় যোগদান করেন এবং ১৯৮৮ সালে একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠার দু'দশকের মধ্যে কেন্দ্রটি বিজ্ঞান গবেষণায় স্বদেশে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্যারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য গবেষণা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও

তবে দুঃখের সাথে বলতে হয় বর্তমান প্রজন্ম জামাল স্যারকে চেনেই না। ক্যামব্রিজের মত জগৎ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ ছেড়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পেরেছিলেন গভীর দেশ প্রেমের কারণে। বিদেশে থাকলে তিনি অনেক বেশী সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন। তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন নোবেল বিজয়ী জ্ঞানতাপস। তারা দেশে-বিদেশে যথাযথ সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কী তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পেরেছি? এই নিরহংকার, প্রচারবিমুখ মানুষটির লেখা এবং আট-নয়টি ভাষায় অনুদিত দ্যা আলটিমেট ফেট অব দ্যা ইউনিভার্স বইটি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে থাকবে। স্যার নিশ্চয়ই আপন মাহাত্ম্য ও ঔদার্যে আমাদের সব অপারগতা ক্ষমা করবেন

ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' রেখেছে। ৭৪ বছর বয়সে ২০১৩ সালের ১৬ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার নিঃসন্দেহে একজন বড় বিজ্ঞানী ছিলেন। যত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তার চেয়েও বড় ছিলেন মানুষ হিসেবে। মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন অমলিন হৃদয়ে। খ্যাতিমান এই মানুষটির কাছে যে কেউ হাজির হতে পারত, তাঁর ঘরের ও হৃদয়ের দরজা থাকত সমানভাবে খোলা। স্যার অত্যন্ত সদালাপি জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। অন্যের সুখে-অসুখে, আনন্দ-বেদনায় বিচলিত হতেন। মাসের শুরুতে বেতন নিয়ে সমস্ত টাকা উজাড় করে শূন্য ব্যাগে বাসায় ফিরতেন হাসি মুখে। তাঁর বাসায় নিয়মিত নানারকম মানুষের আনাগোনা থাকত। এইসব মানুষ স্যারের কাজ, জগৎজোড়া খ্যাতি–এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতো না; জানতো শুধু এই বাসায় একজন দানবীর থাকেন। সেটা শুনে শুনে হাজারো সমস্যার ঝাঁপি নিয়ে এরা আসতো সাহায্যের জন্যে। স্যার এদের যাচাই বাছাই না করেই সাহায্য দিতেন। আক্ষরিক অর্থেই শিশুর মত মন ছিল তাঁর। তিনি কেবল বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন একজন পূর্ণ মানুষও। বিজ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর বিপুল উৎসাহও ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও শিল্পে। তিনি পিয়ানো বাজাতেন। শিল্পী হিসেবেও অছে তাঁর ঘরে আঁকা অসংখ্য ছবি। তিনি অন্যের গুণ ও অর্জনকেও মূল্য দিতে জানতেন। আশেপাশের লোকজনের উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা যোগাতেন আবেগ দিয়ে।

স্যারের প্রিয় বন্ধু ছিল বই। দিনের অনেকটা সময়ই কাটতো বাসার লাইব্রেরি ঘরের বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে। করতেন লেখালেখিও। তবে মহাবিশ্বের পরিণতি কী হতে পারে বা কী হবে–এই জটিল বিষয়টা নিয়ে লেখা তাঁর দ্যা আলটিমেট ফেট অব দ্যা ইউনিভার্স (মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি) বইটি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশ হওয়ার পর বিজ্ঞানী মহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্ণ বিবর' (ব্ল্যাক হোল) এবং রাহাত-সিরাজ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ' এবং 'শিল্প সাহিত্য ও সমাজ' নামক বইগুলো তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সত্যিকারের পণ্ডিত মানুষ ছিলেন কিন্তু সে পাণ্ডিত্যের ভারে কখনোই কোন দম্ভ প্রকাশ করেননি। বরং এ গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে শান্ত, সৌম্য, বিনয়ী একটি রূপ দিয়েছে যা আর কারোর মধ্যে এমন করে দেখিনি।

স্যারের সাথে থাকা (১৯৯০-২০১৩) টাইপিস্টের কাছ থেকে শোনা–স্যার নাকি বলতেন "আমার কাছে কেউ টাকার জন্যে আসলে কখনো নিষেধ করবে না।" সন্ধ্যার পর স্যার যতক্ষণ সেন্টারে থাকতেন টাইপিস্টও থাকত। কোনদিনও নাকি সে স্যারের চায়ের কাপটা চেয়েও ধুয়ে দিতে পারত না। স্যার নিজেই চায়ের কাপ, টিফিন বক্স ধুতেন। স্যার একবার ফটিকছড়ির এক ইফতার পার্টিতে গেছেন। ইফতার সেরে জামাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। সালাম ফিরানোর পরপরই দেখেন এক লোক স্যারের জুতা নিয়ে যাচ্ছে। স্যার কিছুই বলেন নাই। গাড়িতে উঠার সময় ড্রাইভার বলে "স্যার আপনি খালি পা, জুতা কোথায়?" স্যার বলেন "আমি দেখেছি এক লোক আমার জুতা নিয়ে যাচ্ছে, লোকটি নিশ্চয়ই গরীব তাই কিছু বলি নাই। ওকে পেলে এক জোড়া জুতা কিনে দিতাম।" কোন বিলাস দ্রব্যের আড়ম্বর কখনো দেখিনি স্যারের বাসায়। তাঁর একমাত্র বিলাসিতার গাড়িটি তাঁর বড় মেয়ে সাদাফ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। পারলে সেটিকেও বাদ দিয়ে দিতেন। একটিমাত্র বিলাসিতা তাঁর ছিল সেটি বইপত্রের। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সঙ্গীত, রাজনীতি, অর্থনীতি এমন কোন শাখা নেই যে বিষয়ে তাঁর গভীর ধারণা নেই।

খ্যাতির কথা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত ফেলো, 'থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স' ১৯৮৩-৮৪ সালে ও 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি' ১৯৮৫ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৮ সালে তিনি ন্যাশনাল সায়েন্স এন্ড

টেকনোলজি মেডেল পান। সেই সালেই ইতালির আব্দুস সালাম সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স অনুষ্ঠানে তাঁকে মেডেল লেকচার পদক দেয়া হয়। ২০০০ সালে কাজী মাহবুব উল্লাহ এন্ড জেবুন্নেছা ও ২০০১ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন। ৬৫ বছর পূর্তিতে ২০০৪ সালে তাঁকে ইউজিসি প্রফেসর করা হয় এবং ২০০৬ সাল থেকে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০১১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্জাক-শামসুন আজীবন সম্মাননা পদক লাভ করেন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তাঁর গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাঁর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করে। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি করে সেমিনার ও বৎসরে কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করতেন যেখানে নোবেল লরিয়েটসহ বিশ্বের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, অর্থনীতিবিদ, অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতগণ ও বহু শিক্ষাবিদের আগমন ঘটে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের গবেষক ও শিক্ষকদের বহির্বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাজের সাথে পরিচয় ও মেলামেশার মাধ্যমে Exchange of views-এর সুযোগ করে দেয়া। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় ৫০টির মত কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ করেছেন। তিনি বাংলাদেশি গবেষকদের জন্য এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যা করে গেছেন তা অতুলনীয়। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় চিরকাল এটা স্মরণ করবে। তাঁর কারণেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের গবেষকদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। কারো কারো স্মৃতি মানুষের হৃদয়ে চিরকাল জাগরিত থাকে। প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম স্যার এমন একজন ক্ষণজন্মা মানুষ যাঁর কাজ ও স্মৃতি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

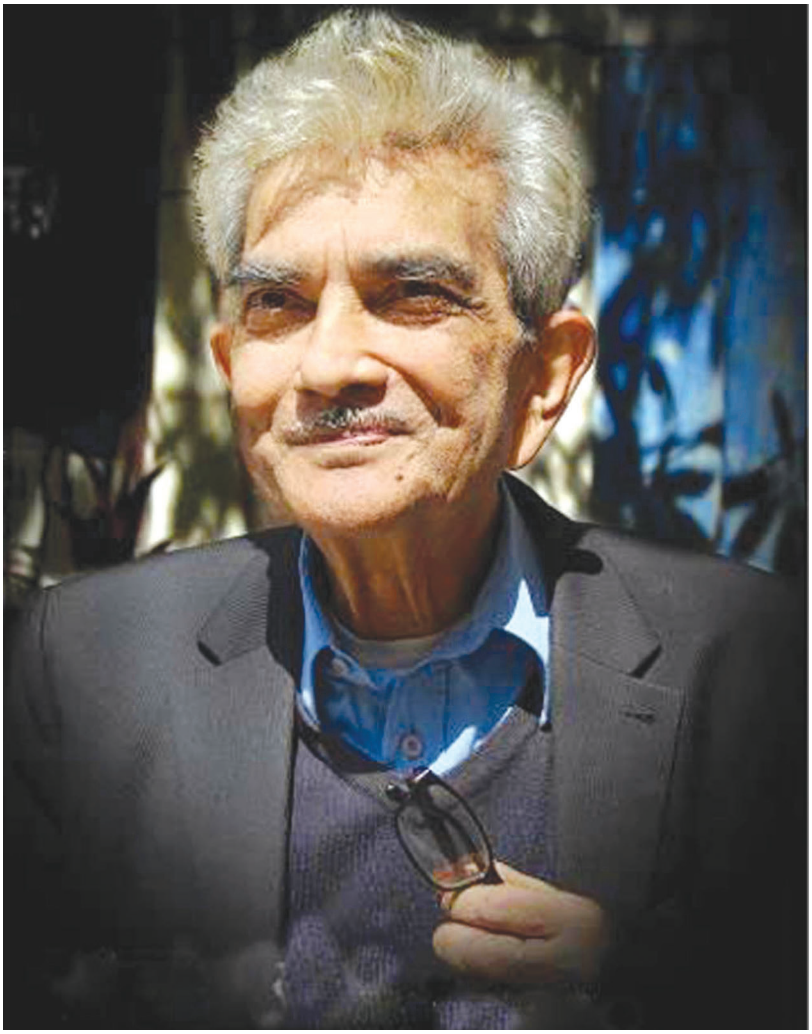

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। সে আলোকে আলোকিত হয়েছেন অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী। একজন মহৎ বিজ্ঞানী এবং আলোকিত মানুষ হবার জন্য তিনি পথ প্রদর্শন করে গেছেন। হিমালয়ের মত বিপুলচিত্ত মানুষটির জীবনাদর্শ আমরা যতই পড়ি ততই বিস্ময়াপন্ন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান।"

তবে দুঃখের সাথে বলতে হয় বর্তমান প্রজন্ম জামাল স্যারকে চেনেই না। ক্যামব্রিজের মত জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ ছেড়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পেরেছিলেন গভীর দেশপ্রেমের কারণে। বিদেশে থাকলে তিনি অনেক বেশী সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন। তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন নোবেল বিজয়ী জ্ঞানতাপস। তারা দেশে-বিদেশে যথাযথ সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কী তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পেরেছি? এই নিরহংকার, প্রচারবিমুখ মানুষটির লেখা এবং আট-নয়টি ভাষায় অনুদিত দ্যা আলটিমেট ফেট অব দ্যা ইউনিভার্স বইটি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে বাংলাদেশি বিজ্ঞানিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে থাকবে। স্যার নিশ্চয়ই আপন মাহাত্ম্য ও ঔদার্যে আমাদের সব অপারগতা ক্ষমা করবেন।

লেখক: অধ্যাপক (সাবেক চেয়ারম্যান), গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মহাবিশ্বের অতি সান্নিধ্যে

রিয়াজ মাহমুদ

পৃথিবীর অজানা বিষয় সম্পর্কে জানার কৌতূহল মানুষের অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অজানা রহস্যের অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাশূন্যের রহস্য অনুসন্ধান করছে। আবিষ্কার করেছে অজানা গ্রহ-নক্ষত্র। মহাশূন্যের প্রারম্ভিক অবস্থা নিয়ে চলছে নানা গবেষণা। ভিন্ন গ্রহে প্রাণের সন্ধানে ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহে। জানান দিচ্ছে নতুন নতুন রহস্যের। বিজ্ঞানের এই গবেষণার পথ নিরবচ্ছিন্ন মসৃণ নয়। পদে পদে পাহাড়সমান বাধা পেরুতে হয়েছে। প্রকৃতি ও যুগের সীমাবদ্ধ আর বাধা অতিক্রম করার পাশাপাশি প্রচলিত সমাজের মননকাঠামোতে জেঁকে বসা দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। সমাজে বিরাজমান সংস্কার বিজ্ঞানের সত্য সহজেই গ্রহণ করতে চায়নি। বিজ্ঞানের গবেষণার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বারেবারে। জীবন কেড়ে নিয়েছে বিজ্ঞানিদের। তবু সত্য অনুসন্ধান ও প্রকাশে এক বিন্দু পিছপা হননি বিজ্ঞানিরা। জীবন দিয়েছেন কিন্তু সত্যকে হারতে দেননি। সময়ের প্রবাহমান জাহাজে চড়ে আজ পৃথিবীবাসী জেমসওয়েব টেলিস্কোপের যুগে প্রবেশ করেছে। প্রথম ধাপের পাঁচটা ছবিতেই নাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে। বিগব্যাংয়ের আরো কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে মানুষকে। দেশে দেশে জল্পনা-কল্পনা চলছে কবে যাব ভিনগ্রহে। যদিও বিজ্ঞানিরা আশা করছেন ২০৪৮ সাল নাগাদ মানুষ পৃথিবীর বাহিরে অন্য একটা গ্রহে বসবাস শুরু করবে।

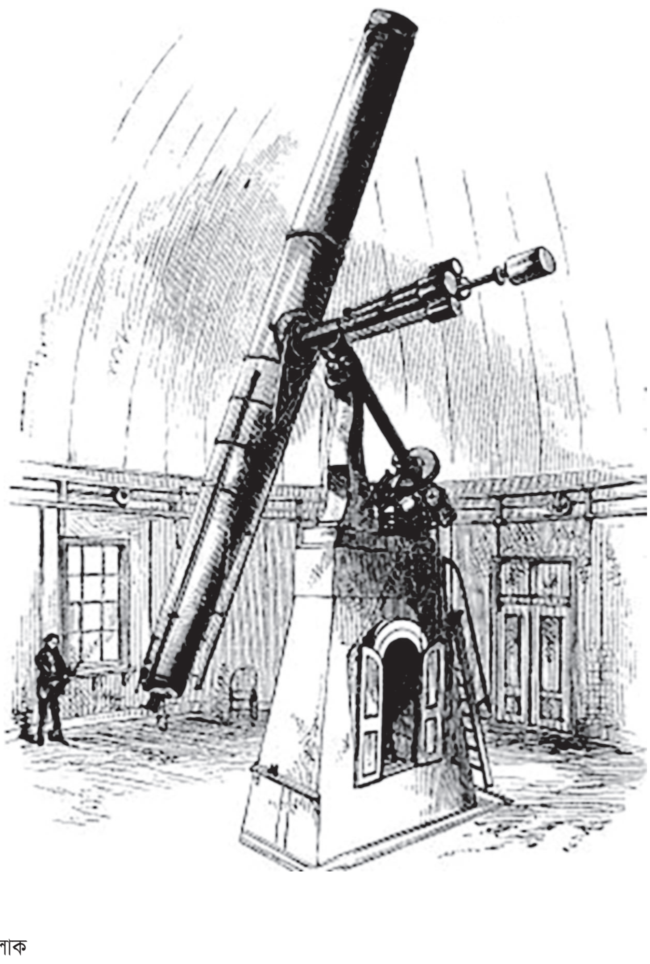

মহাশূন্য মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায় যখন বিজ্ঞানি গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। ১৬১০ সালে প্রথম টেলিস্কোপ দিয়ে বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। আড়াই হাজার বছর ধরে যে প্রক্রিয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা চলছিল–তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। জ্যোতির্বিজ্ঞানিরা বুঝতে পারলেন 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' আরো শক্তিশালী টেলিস্কোপ আবিষ্কার হতে থাকলো। টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো অবজারভেটরি।

তবু নিজের অক্ষে বসে সবকিছু কি যায় জানা? আসলেই যায় না। নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়। চেষ্টা থেমে যায়নি। বরং বিজ্ঞানিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। মহাশূন্যের আরো নিকটে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সেই চেষ্টার ফলে ১৯৯০ সালের ২৪শে এপ্রিল মহাকাশে পাঠানো হলো হাবল টেলিস্কোপ। যদিও মহাবিশ্বের অনেক রহস্যের সমাধান হয়েছে পৃথিবীতে বসানো টেলিস্কোপ দিয়ে, তবু হাবল টেলিস্কোপ নতুন নতুন রহস্য সমাধানের নবদিগন্ত খুলে দিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রবেশ করলো স্যাটেলাইট টেলিস্কোপের যুগে। এতদিন টেলিস্কোপগুলো স্থাপন করা হত উঁচু কোন পাহাড়ের উপর। হাবল টেলিস্কোপ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে ৫৪৭ কিলোমিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হয়। যা ঘণ্টায় ২৭ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। হাবল টেলিস্কোপ পৃথিবীবাসীকে এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলো। ব্ল্যাকহোলের ধারণা প্রমাণিত হয়। মহাবিশ্বের উৎপত্তি ১ হাজার ৩৮০ কোটি বছর পূর্বে–যা হাবল টেলিস্কোপ প্রমাণ করে। প্রায় ১৮ হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণা গত ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে হাবলের সাহায্যে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি

করে। কিন্তু জানার তো কোন শেষ নেই। অজানাকে কি মানুষ জানবে না? মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অজানাকে জানা। ফলে বিজ্ঞানিরা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দিন পার করলেন না। হাতে তুলে নিলেন আরো শক্তিশালি প্রজেক্ট। কারণ হাবল টেলিস্কোপ পৃথিবীর কাছাকাছি ঘুরছে বলে পৃথিবী টেলিস্কোপের দৃষ্টিপথ রোধ করে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ভ্যানঅ্যালেন রেডিয়েশন বেল্টের কাছ দিয়ে ঘুরাঘুরি করায় পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যন্ত্রপাতিতে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ সৃষ্টি করে। হাবল টেলিস্কোপের ফেইন্ট অবজেক্ট ক্যামেরা এবং ফেইন্ট অবজেক্ট স্পেকট্রোমিটার অতিদূর নক্ষত্র থেকে আসা আলো থেকে যে ছবি সংগ্রহ করে তা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল ও অস্পষ্ট। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করে জ্যোতির্বিজ্ঞান নতুন বিপ্লবের সূচনা করে যার নাম–জেমসওয়েব। যা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে।

২. রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি আলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন। ওই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবনভরা ... ইত্যাদি। প্রতিনিয়তই আলো দেখতে পাই। তাই তার গুরুত্ব তেমন উপলব্ধিতে আসে না। ব্যক্তিত্বের আলোতে যেমনি সমাজ আলোকিত হয় তেমনি নক্ষত্রের আলোতে তার দূরত্ব মাপা যায়। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু আলো। শূন্য মাধ্যমে আলোর গতি ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল। উৎস থেকে আলো একই মাধ্যমে চললে গতিপথে কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু আলো চলার পথে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা হলো বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ। যার কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য একে অপরের বিপরীত আনুপাতিক। অথাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে কম্পাঙ্ক কমে যায়। এক্সপান্ডিং ইউনিভার্সের ধারণাতে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হচ্ছে একই সাথে আলোর তরঙ্গও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। আলো এক সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার যায়। আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে এই দূরত্বকে বলা হয় আলোকবর্ষ। এখন পৃথিবী থেকে কোন একটা নক্ষত্র যদি এক আলোকবর্ষ দূরে থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগবে ১ বছর। আমরা জানি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। এখন এই সময়কে আলোর গতি দিয়ে গুণ করলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বের করতে পারি। অর্থাৎ আমরা পৃথিবী থেকে যে সূর্যকে দেখি তা আসলে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড অতীতের সূর্য। একইভাবে নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে যদি এক হাজার বছর লাগে তাহলে আমরা আসলে এক হাজার বছরের পুরনো আলোকে দেখছি।

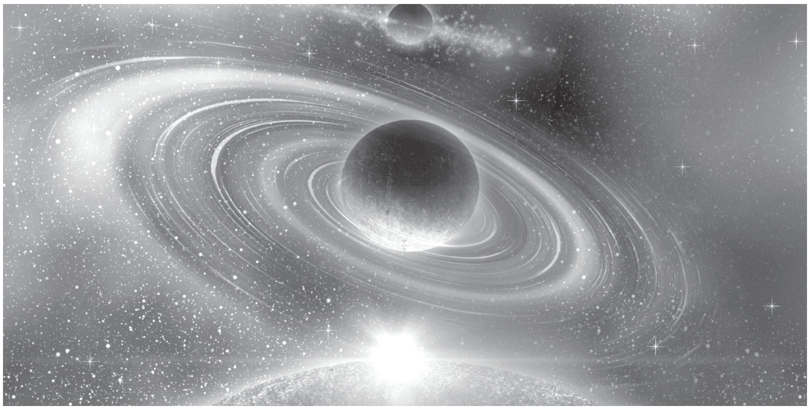

জেমসওয়েব টেলিস্কোপ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে ভেসে আসা অবলোহিত আলো শনাক্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্বের সব ধরনের অণুর ধর্ম পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা। গত ১২ জুলাই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা ছয়টি ছবি প্রকাশ করেছে নাসা। এই ছবিগুলোর থেকে বিজ্ঞানিরা স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন কিছু গ্যালাক্সির বয়স পৃথিবীর বয়সের কাছাকাছি অথাৎ ৪৬০ কোটি বছর। অন্য কিছু গ্যালাক্সির বয়স ১ হাজার ৩ শত কোটি বছর জেমসওয়েব এই গ্যালাক্সিগুলোর ডেটা সংগ্রহ করা শুরু করেছে। যা থেকে পৃথিবীবাসী বুঝতে পারবে প্রথম প্রজন্মের গ্যালাক্সিগুলো কিভাবে গঠিত হয়েছিল। এছাড়া নক্ষত্রের জন্ম, গ্যাস ও ধুলিকণা থেকে তার ভেতরের তথ্য জানা যাবে এবং নক্ষত্রের জন্মমৃত্যু হওয়ার প্রক্রিয়া জানা যাবে এই ছবিগুলো থেকে। গ্যালাক্সির আকৃতি-প্রকৃতি ও নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুর চৌকষ প্রমাণ হাজির হবে জেমসওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে।

৩. জেমসওয়েব টেলিস্কোপ প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো মসৃণ করবে। জেমসওয়েব শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্ময়ই নয়। এটি সম্পূর্ণ প্রকৌশলবিদ্যার বিস্ময়। জেমসওয়েবের ১৮টি আয়নাকে সঠিকভাবে ভাঁজ খুলতে ও নির্দিষ্ট অবস্থানে গিয়ে সবকটি মিলে একটি প্রতিফলন তল তৈরি করার প্রয়োজন হয়। এই নিখুঁত পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে স্ক্যানিং শ্যাক-হার্টম্যান সেন্সর। এই যন্ত্র বিভিন্ন সার্জারি, চোখের চিকিৎসা ও নতুন রোগ শনাক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এতে চোখের চিকিৎসা একেবারে মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। অন্যদিকে তাপমাত্রা পরিমাপ ও ছবি তোলার কম্পন ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে উদ্ভাবন করা হয় হাইস্পিড লেজার ইনফেরোমিটার যন্ত্র। এই যন্ত্র রকেট, বিমান পরিচালনা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে লাগবে। এছাড়া কোয়ান্টাম কম্পিউটার বা আরো উন্নত সুপার কম্পিউটার বানানোর কাজে এই যন্ত্রের ব্যবহার হবে। বিজ্ঞানের প্রতিটি গবেষণা ও আবিষ্কারের সাথে মানবকল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জেমসওয়েব প্রজেক্ট তার শক্তিশালী সংযোজন।

লেখক: কবি ও কলামিস্ট

শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে

কাজী বজলুর রহমান

গ্রামগঞ্জের স্কুলকলেজে লেখাপড়ায় একটা প্রধান অসুবিধা হলো স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থী উপস্থিত না থাকা এবং যারা স্কুলে আসে তারাও নিয়মিত আসে না। যে আজ আসল তো সে কাল নাই। এছাড়া টিফিন পিরিয়ডের পর অনেক শিক্ষার্থী পালিয়ে যায়। এ সমস্যা বহুদিনের আলোচিত বিষয়। কিন্তু সমাধান হচ্ছে না। বরঞ্চ দিনকে দিন সমস্যাটি বেড়েই চলেছে। এ সমস্যাটি জটিল করে তুলেছে প্রাইভেট পড়ানো। শিক্ষকগণ প্রাইভেট পড়াতে আগ্রহী। ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে তারা অনেকেই ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনগুলোতে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি কি দাঁড়ায় তা চিন্তা করলে সত্যি অন্ধকার দেখতে হয়। এই অন্ধকার দিকে না গিয়ে আলোর দিকে কিভাবে আসা যায় তা বের করতে হবে।

আমাদের স্যারদের কাছে সমস্যাটির কথা বললে তারা উত্তর দেন, আমরা কী করব? শিক্ষার্থী না আসলে আমরা পড়াবো কিভাবে? প্রাইমারি স্কুলের জন্য হোমভিজিটের একটি অপশন আছে। কিন্তু তারা তা সঠিকভাবে করেন কিনা তা নিয়ে জনগণের মনে দ্বিধা আছে।

একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষাদানের জন্য যারা ভূমিকা রাখতে পারেন তারা হলেন সরকার, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। সরকারের একটা নীতি তো নির্ধারণ করা আছেই। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার ভার থাকে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ওপর। এখন কমিটি/গভর্নিং বডিতে যারা থাকেন তাদের অনেকেরই শিক্ষার উন্নয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান সীমিত। অভিভাবকগণ সেভাবে সচেতন নন যে তারা সন্তানদের নিয়মিতভাবে স্কুলে পাঠাবেন। তাই মূল দায়িত্বটা শিক্ষককে নিতে হবে।

শিক্ষকগণ যা যা করলে শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে আসবে তা হলো:

১। স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান-প্রধান কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবেন শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত করানোর জন্য। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

২। শিক্ষকগণ অভিভাবকদের সচেতন করে তুলবেন।

৩। বছরে অন্তত ২/৩ বার মা-সমাবেশ করবেন।

৪। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর অনুপস্থিত থাকার কারণ অভিভাবককে ফোন করে জানবেন। কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করবেন।

৫। শিক্ষক একজন সমাজকর্মী। তাই একজন সমাজকর্মীর ন্যায় অভিভাবকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

৬। তিনি শিক্ষার্থীদের বন্ধু হবেন।

৭। তিনি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ছোটখাটো সমস্যাগুলি সমাধান করবেন।

৮। শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলবেন।

৯। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে শিক্ষক তা বের করে আনবেন।

১০। শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আনন্দময় স্থানে পরিণত করবেন।

লেখক: অধ্যক্ষ (অব.), সৈয়দপুর স্কুল এ্যান্ড কলেজ, পাবনা

একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষাদানের জন্য যারা ভূমিকা রাখতে পারেন তারা হলেন সরকার, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। সরকারের একটা নীতি তো নির্ধারণ করা আছেই। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার ভার থাকে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ওপর। এখন কমিটি/গভর্নিং বডিতে যারা থাকেন তাদের শিক্ষার উন্নয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সীমিত। অভিভাবকগণ সেভাবে সচেতন নন যে তারা সন্তানদের নিয়মিতভাবে স্কুলে পাঠাবেন। তাই মূল দায়িত্বটা শিক্ষককে নিতে হবে

শিশুর শিক্ষা

মাহফুজ সালাম

সরকারি স্কুলের পাশাপাশি এক শ্রেণির কিন্ডার গার্টেন স্কুলের আবির্ভাব বেশি দিনের নয়। তা প্রায় বছর বিশেক হবে। এইসব স্কুলে প্রথম শ্রেণির আগেই ক্লাস আছে তিনটি–নার্সারি, প্লে ও কেজি। এরপর প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি। তার মানে দাঁড়ালো পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে একজন শিশুকে আরও তিনটা ক্লাসের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে আসতে হচ্ছে। শিশুর পরিবারকে গুণতে হচ্ছে ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, বই কেনা, পোশাক খরচ, কোচিং, যাতায়াত খরচ, এবং পাঁচ শ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন। পরীক্ষাতো আছেই প্রতি তিন মাসে একটা করে, সাথে পরীক্ষার ফি।

লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করাই হয়ত এর প্রধান লক্ষ্য, ভাল কথা। কিন্তু এখানে মুক্ত পরিবেশ কই, খেলাধুলা কই, খেলার মাঠ কই? এর বিপরীতে আছে–লম্বা সিলেবাস, পরীক্ষা, ক্লাসে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় হবার প্রতিযোগিতা। ছেলেমেয়েদের বিদ্বান বানানোর জন্য বাবামার মরণপণ চেষ্টা। ফলে মায়ের পেট থেকে পড়েই আনন্দ নয়, শিক্ষার প্রতি এক ধরনের ভীতি ও অনীহা শিশুদের মাথায় চেপে বসে। যখন সে সকালে ঘুমাবে তখন তাকে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম শর্ত হচ্ছে ছাত্রদের খেলার মাঠ থাকতে হবে। অথচ কিন্ডার গার্টেনগুলোর কোন প্রকার খেলার মাঠ নাই, নাই নিজস্ব ভবন। হাল আমলে ব্রয়লার মুরগি পালনের সাথে অনেকেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনা করেন। মুরগির খামারের খাঁচায় মুরগি পালনের মতোই খাঁচায় শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক খামারের মতো বাণিজ্যিক শিক্ষা–যেমন বিনিয়োগ তেমন লাভ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারী পুঁজি খাটাবেন লাভ করবেন বলে। আমরা কী শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থার শিকার?

এবার আসি আগের দিনের কথায়। আজকে যাদের বয়স ষাটোর্ধ্ব, ৮ বছর বয়সের আগে তারা কেউ স্কুলে যায়নি। ছোটবেলায় তারা যখন গ্রামের স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়তেন তখন তাদের প্রথম হাতে খড়ি হতো মদন মোহন তর্কালংকারের শিশুশিক্ষা বই নিয়ে। সাথে ছিল 'সবুজসাথী'। খুব ছোট আকারের একটি বই, যার দৈর্ঘ্য ছিল সম্ভবত ৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ছিল ৪ ইঞ্চি এবং ওজন ৫০ গ্রামের কম। শিক্ষা উপকরণ ছিল ৪টি। সবুজসাথী, ধারাপাত, একটি স্লেট ও পেন্সিল। স্কুলে যাবার সময় তারা এই শিক্ষা উপকরণ হাতে করে নিয়ে যেতেন এবং হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তাদের কোন ব্যাগ ছিল না, ব্যাগের মধ্যে কোন টিফিন ছিল না, পানির বোতল ছিল না। ঐ ছোট বেলায় তাদের বাবামায়েরা হাত ধরে কোন স্কুলের পথ দেখাননি। স্কুলে যাবার বয়স হলে পাড়ার উপরের ক্লাসে পড়া বড়দের সাথে দল বেঁধে তারা একসাথে স্কুলে যেতেন। স্কুলের ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট পোশাক ছিল না। স্কুলে যাবার সময় পড়তে হতো হাফ প্যান্ট, হাফহাতা শার্ট, বাম পাশে থাকতো একটা বুকপকেট। খালি পায়ে হেঁটে ক্লাসে গিয়ে বেঞ্চে বসতেন তারা। শহরের স্কুলগুলোতে হয়ত এর কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু নব্বই ভাগ গ্রামের স্কুলগুলোর চিত্র কমবেশি এ রকমই ছিল। এরপর এসেমব্লি হতো, তাতে গাওয়া হতো জাতীয় সংগীত।

এসেমব্লি শেষ করে ক্লাস। শুরুতেই পড়তে হতো স্বরবর্ণ। অ-আ-ই-ঈ ইত্যাদি শেষ হলে নতুন পাঠ 'ব্যাঞ্জনবর্ণ'। অক্ষরের সাথে অক্ষর মিলে কিভাবে শব্দ হয় তা পড়াতেন শিক্ষক, ক'র সাথে র যুক্ত হয়ে শব্দ হতো কর, দ্বিরুক্তি শব্দ করে বলা হতো কর-কর, খ-এর সাথে র যুক্ত হয়ে খর-খর। এমনি করে গর-গর, ঘর-ঘর, জর-জর, ঝড়-ঝড়। এরপর সরল পাঠ 'শিল খায় কিল খায়, ধর বচন কর চরণ'। পাঠ শেষে শিক্ষক বুঝাতেন, শিল মানে চরিত্র, এটা নষ্ট হলে মানুষ কিল খায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে পড়ানো হতো নীতি কথা–গুরু জনে কর নতি। এরপর সুললিত কবিতা পাঠ–'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি ফুটিয়া উঠিল।' আবার, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি, আদেশ করেন যাহা মোর গুরু জনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে' ইত্যাদি।

এই বইটি মুখস্ত করে সবাই আবৃত্তি করতো। রাতে মা-বাবার বুকে শুয়ে শুয়ে গড় গড় করে শুনিয়ে দিত সেসব পড়া। এই বই শেষ করে সবুজসাথী। সবুজসাথী বই ছিল এ-ফোর সাইজের। তাতে বাংলা, অংক ও ইংরেজি একসাথে থাকতো, অন্য একটি বই ছিল ধারাপাত। তা থেকে শিখানো হতো

নামতা। ছিল ছড়া, প্রতিটি ছড়ায় ছিল একেকটি শিক্ষণীয় বিষয়, ছন্দের খেলা, বাংলার প্রকৃতি, পাখি-গাছপালা ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল ছোট ছোট উপদেশমূলক গল্প। রাখালের, শিয়ালের, বাঘ ও বকের, সিংহ মামার, বিড়ালের ইত্যাদির গল্প। অংক ছিল যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের। তাও অনেকটা গল্পের মত করে শিখানো হতো। একটি গাছে ১০টি পাখি আছে তা থেকে ৫টি চলে গেল কয়টি রইলো। হাতের কর গুণে সবাই উত্তর দিত–৫টি।

যা বলে শেষ করতে চাই–আসলে আমরা আমাদের সন্তানদের কীভাবে দেখতে চাই? শিশুর জন্মের পর থেকেই বাবা-মার মাথায় চিন্তা একটাই, সন্তান মানুষ করা। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শিশু জন্মেইতো পুষ্টিহীনতা নিয়ে। জন্মের পর থেকে পুষ্টিকর খাবারের চেয়ে বিষাক্ত খাবারই খেয়ে বড় হয়। আজকের শিশুদের বেড়ে ওঠা, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক সক্ষমতা, ধারণ ক্ষমতা, প্রতিবেশ এবং আমাদের অভিভাবকত্ব–কতটুকু সহনীয় পর্যায়ে আছে শিশুদের জন্য তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম শর্ত হচ্ছে ছাত্রদের খেলার মাঠ থাকতে হবে। অথচ কিন্ডারগার্টেনগুলোর কোন প্রকার খেলার মাঠ নাই, নাই নিজস্ব ভবন। হাল আমলে ব্রয়লার মুরগি পালনের সাথে অনেকেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনা করেন। মুরগির খামারের খাঁচায় মুরগি পালনের মতোই খাঁচায় শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক খামারের মতো বাণিজ্যিক শিক্ষা–যেমন বিনিয়োগ তেমন লাভ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারী পুঁজি খাটাবেন লাভ করবেন বলে। আমরা কী শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থার শিকার?

আমরা ৩-৪ বছর বয়সে বাচ্চাকে সাজিয়েগুজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি স্কুলে। নানা পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। আমরা মা-বাবারা শিশুর পরীক্ষায় একশতে একশ নম্বর দেখতে চাই। টাকা খরচ করে টিউটর রাখছি। একটু খারাপ করলে কী আচরণ করছি তাদের সাথে? দোষারোপ করছি–তুই কখনও আমার কথা শুনিস না, ভাল রেজাল্ট করবি কেমনে। তুলনা করছি অন্যদের সাথে–তোর খালাত বোন কত সুন্দর রেজাল্ট করলো, তুই পাইলি গোল্লা। ভর্ৎসনা করি–তুই একটা গাধা, একটা রামছাগল, কাল থেকে ঘাস খেতে দিব। টিনএজ ছেলেমেয়েদের আমরা বলি, তোদের জন্য চিন্তা করতে করতে শেষ হয়ে গেলাম, কী পাইলাম! ভয় দেখাই, লেখাপড়া না করিস তো ভ্যান চালা গিয়ে ইত্যাদি।

এতে শিশু কিশোরদের মনের অবস্থা কী দাঁড়ায় তা কী আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? ওরা বাবা মার কাছে অসহায় হয়ে যায়। বাবামা হয়ে পড়ে সন্তানের প্রতিপক্ষ। ফলে শিশুদের মনে এক ধরনের রাগ, জিদ, ক্ষোভ, ক্ষেপামি, কষ্ট, হিংসা ও রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। হ্যাঁ, আমি পারি না, আমি খারাপ, আমার দ্বারা হবে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ অবস্থা থেকেই কিশোর মনে বিষণ্নতা বাসা বাঁধতে থাকে, তাদের মনে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, হতাশায় নেশার পথ বেছে নিতে পারে। আমরা সন্তানের সাথে এমন আচরণ যেন না করি। আমরা শিশুদের বন্ধু হবো।

স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এ দেশের অনেক ঈর্ষণীয় অর্জন আমাদের আছে। শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন এবং বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

লেখক: সমাজকর্মী ও ছড়াকার

শতাব্দীর সাক্ষী

নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

আবু কামাল খন্দকার

নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের বয়স আজ একশো ছাব্বিশ বছর। নির্বাক ইতিহাসের পথপরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি ইটের পাঁজরে জড়িয়ে আছে অসংখ্য স্মৃতিকথা, উত্থান-পতন ও আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নবীনগরে তৎকালীন জমিদার কৃষ্ণ মোহন রায় চৌধুরী তাঁর বাড়িসংলগ্ন দক্ষিণে একটি মিডল ইংলিশ স্কুল (এম.ই.স্কুল) স্থাপন করেন। স্থানীয় জমিদার স্কুলটির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। পরবর্তী সময় ১৮৮৫ সালে নবীনগরে স্থাপিত হলো মুন্সেফ আদালত। দু'জন মুন্সেফ, ৩২ জন উকিল-মোক্তার ও আদালতের কর্মচারীগণ কার্যোপলক্ষে নবীনগরে বসবাস শুরু করলেন। কিন্তু অচিরেই এই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। কারণ এম.ই স্কুল থেকে পাশ করার পর কাছাকাছি কোন হাইস্কুল নেই। এই সমস্যা শুধু তাদের ছিল না, সমগ্র নবীনগর থানাসহ পার্শ্ববর্তী হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রায়পুরা থানার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিরাজ করছিল। কারণ ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইলে অন্নদা হাই স্কুল এবং মুরাদনগরে বাঙ্গরা উমালোচনা হাইস্কুল ব্যতীত এতদাঞ্চলে আর কোন হাইস্কুল ছিল না। অতএব, প্রয়োজনের তাগিদেই একটি হাই স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হলো।

স্থানীয় মুন্সেফ, আদালতের আইনজীবীবৃন্দ, জমিদার পরিবারসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে সম্মিলিত সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে এলেন তৎকালীন বারের একমাত্র মুসলিম আইনজীবী মরহুম উকিল আবদুস সোবহান ওরফে আবদু মিয়া সাহেব (বাড়ি–মুরাদনগরের ভুবনঘর গ্রামে)। তিনিই হলেন নবীনগর হাই ইংলিশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। নবীনগর হাই ইংলিশ স্কুল থেকে নবীনগর হাইস্কুল, পরবর্তী সময় নবীনগর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর হয়। অবশেষে ৭ মে ২০১৮এ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে সরকারি ঘোষণার পর নবীনগর এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের একটি প্রাণের দাবি বাস্তবায়িত হলো।

১৮৯৬ সালের ১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ৫০ জন ছাত্র নিয়ে নবীনগর হাইস্কুল চালু হয়। প্রথম পর্যায়ে পুরানো এম.ই স্কুলঘরসহ নতুন আরেকটি ঘর নিয়ে এইচ ই স্কুলের কাজ শুরু হয়। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন আদালতের তৎকালীন ১ম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কালিনাথ ধর। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮ জনে দাঁড়ায়, যার মধ্যে

ত্রিপুরা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার ১২ জন ছাত্রও ছিল। ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদার বাড়িসংলগ্ন পূর্ব স্থানে স্কুলে স্থান সংকুলান সমস্যা দেখা দেয়। তাই জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদার ১৪৩ টাকা দিয়ে বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গণের জায়গাটি ক্রয় করা হয়। ১৮৯৭ সালের ১৪ এপ্রিল ১৪৩৬ টাকা ব্যয়ে লম্বা কাঁচা স্কুলঘর তৈরি করা হয়। পূর্বের মিডল ইংলিশ স্কুলটি ১৮৯৮ সালে একই পরিচালনা পরিষদের আওতাধীনে নবীনগর হাই ইংলিশ স্কুলের সাথে একীভূত হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠালগ্নে কাঁচা ভিটা, খড়ের চাল এবং বাঁশের বেড়ায় নির্মিত L টাইপের লম্বা ঘরে বিদ্যালয়টি চালু হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অতি অল্প সময়ের জন্য শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সরকার বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময় মাসিক ৬৫ টাকা বেতনে সিলেটের শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ দাস, বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া একজন গ্র্যাজুয়েট (সহকারী প্রধানশিক্ষক) সহ ৭ জন ইংরেজি শিক্ষক, ২ জন পণ্ডিত এবং ১ জন মৌলভীকে স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুস সোবহান সাহেব বিনাবেতনে খণ্ডকালীন ফার্সি শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময়ে শিক্ষক কর্মচারীদের মোট মাসিক বেতন ছিল ২৮১ টাকা। অবশ্য ছাত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে ১৯১১ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১৯ জনে দাঁড়ায়। প্রথমদিকে স্কুলে ৮টি ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো হতো। পাঠ্যবিষয় ছিল ইংরেজি, বাংলা , সংস্কৃত, ফার্সি, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, এলজেব্রা, জ্যামিতি ও শরীরচর্চা। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশ্য ২০০০ সালে বিদ্যালয়ে একটি প্রভাতী কিন্ডারগার্টেন চালু করা হয়েছে। তখন সকাল ১১ টায় স্কুল বসত, ছুটি হতো বিকেল ৪ টায়। শনিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্লাস, রোববার ছুটি ।

মাসিক ছাত্র বেতন ছিল সর্বনিম্ন ৮ আনা, সর্বোচ্চ দেড় টাকা। ডিসেম্বর ১৮৯৬ থেকে জানুয়ারি ১৮৯৮ পর্যন্ত সময়ে গড়ে প্রতি মাসে ছাত্র বেতন হিসেবে ১৩০ টাকা পাওয়া যেতো। অথচ মাসিক শিক্ষক কর্মচারীদের মোট বেতন বাবদ ব্যয় হতো ২৮১ টাকা। তন্মধ্যে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয়া হতো জেলাবোর্ড থেকে প্রতিমাসে ৩০ টাকা, স্থানীয় বার লাইব্রেরি থেকে প্রতিমাসে ২৫ টাকা এবং জমিদার পরিবারও আর্থিক সাহায্য করতেন। বাদবাকি অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতেন স্থানীয় আইনজীবীবৃন্দ। তাই নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে নবীনগর মুন্সেফ আদালতের আইনজীবী ও কর্মচারীবৃন্দের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া ঢাকার নওয়াব ও ত্রিপুরার মহারাজাও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কয়েক বছর নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এ বিদ্যালয়ও আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় অংশ নিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ে তুলবে। আশা করি ঐতিহ্যের গৌরবে সুখ্যাতির সৌরভে দিনদিন সমৃদ্ধ হবে নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

১৮৯৭ সালের ১০ মে বিদ্যালয়ে জুভেনাইল ক্লাব (ডিবেটিং ক্লাব) চালু করা হয়। ইংরেজি কথনে দক্ষতা অর্জনসহ নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির লক্ষে জুভেনাইল ক্লাবের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি শনিবার নিয়মিতভাবে ডিবেটিং ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। তাছাড়া ছাত্রদের নিয়মিত শরীরচর্চা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে স্কুলের ৫২ জন আগ্রহী ছাত্র নিয়ে একইসময়ে নবীনগর স্পোর্টিং ক্লাব গঠন করা হয়। তাদের সুবিধার্থে স্কুল থেকে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামও কিনে দেয়া হয়।

১৮৯৭ সালেই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চালু হয়। পূর্বের এম ই স্কুলের ১৭০টি বই এবং নতুন ক্রয়কৃত বিভিন্ন বিষয়ের ৩০টি ভলিয়্যুমসহ ওই নতুন লাইব্রেরি সেদিন যাত্রা শুরু করেছিল। আজ সেই স্কুল লাইব্রেরিতে কয়েক হাজারের বেশি পুস্তক সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সহযোগিতায় বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মাঝে পালা করে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারের পুস্তক বিতরণ করা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এত সন্তুষ্ট হন যে, ১৮৯৭ সালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করে।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় মুন্সেফ আদালতের ১ম মুন্সেফ মহোদয় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, ১৯৩৬ সালে নবীনগরের তৎকালীন সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত শশাংক শেখর চক্রবর্তী এম এ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ে পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ২য় মুন্সেফ, জমিদার পরিবারের ৩ জন প্রতিনিধি, স্থানীয় বারের ২ জন উকিল, ২ জন সেরেস্তাদার, স্থানীয় সাব রেজিস্ট্রার, নবীনগর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ও নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাদের সদস্য করে বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়।

১৮৯৯ সালে দূরবর্তী এলাকার এবং বিভিন্ন জেলার বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে স্কুলের বর্তমান খেলার মাঠসংলগ্ন উত্তর পাশে হিন্দু ছাত্রদের জন্য ১টি হিন্দু হোস্টেল এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য তৎকালীন দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে (বর্তমানে মহিলা কলেজের অংশ) একটি মুসলিম হোস্টেল স্থাপন করা হয়। অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়সংলগ্ন স্থানে হিন্দু হোস্টেলের পাশে মুসলিম হোস্টেলটি স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া মুসলিম ছাত্রদের

ধর্মচর্চার সুবিধার্থে ১৯১৬ সালে স্কুলের সম্মুখস্থ রাস্তার দক্ষিণ পূর্বদিকে জল্লা গ্রামের মরহুম আফছার উদ্দিনের দানকৃত ৫ শতক জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় ।

১৮৯৮ সালে ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধার্থে জমিদার গোপীমোহন রায় চৌধুরী নিজ অর্থ ব্যয়ে একটি পাকা কালভার্ট নির্মাণ করে দেন। ছাত্রদের সুখসুবিধার প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের সদা প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই ছাত্রদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে স্কুল ফান্ড থেকে মাসিক ৫ টাকা হারে সম্মানি ভাতা দেয়া হতো। এছাড়া ১৯১৬ সালের দিকে বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণির ক্লাসে গরমের দিনে হাতে টানা পাখার বন্দোবস্ত ছিল।

১৯০০ সালের ১৪ জুলাইয়ে বিদ্যালয়ে সুনীতি সঞ্চারিণী সভা নামে একটি আবশ্যিক ক্লাস চালু করা হয়। এর মূল কর্মসূচি ছিল 'চিন্তা ও কর্মে উন্নত হও।' প্রথম দিকে প্রতি ১৫ দিনে একবার এবং পরবর্তী সময় প্রতি শনিবার সুনীতি সঞ্চারিণী সভার ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। স্কুলের সকল ছাত্রদের মোট ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করে সুনীতির ক্লাস নেয়া হতো। উচ্চতর শ্রেণির ছাত্রদের ক্লাস নিতেন প্রধান শিক্ষক নিজেই, নিম্ন ক্লাসের ছাত্রদের ক্লাস নিতেন হেডপণ্ডিত বাবু এবং মুসলিম ছাত্রদের ক্লাস নিতেন বিদ্যালয়ের মৌলভী শিক্ষক। ১৮৯৮ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৈহিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে বিদ্যালয়সংলগ্ন দক্ষিণে একটি নিচু জমি (জমিদার গোপীমোহন রায় চৌধুরীর দানকৃত) খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী সময় ১৯১১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার S.D.O. Mr wares এবং সহকারি জেলা পুলিশ সুপার Mr. Ferze-এর প্রভৃত সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে ৮ বিঘা জমি সরকারি রিকুইজিশানের মাধ্যমে খেলার মাঠটির আয়তন বৃদ্ধিসহ ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়। শিক্ষকদের আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণের জন্য ১৯০৩ সালে ৮৫ টাকায় একটি জায়গা ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত জায়গাটি হচ্ছে বর্তমান উপজেলা পরিষদ ভবনের উত্তরে ধোপা পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে। অবশ্য পরবর্তী সময় জায়গাটি অন্যত্র বিক্রি করে বিদ্যালয়সংলগ্ন পশ্চিম দিকে স্টাফ কোয়ার্টার্স তৈরি করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের মোট জায়গার পরিমাণ হচ্ছে ৫.৪৬ একর।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই স্কুলে শিক্ষার মান ছিল অত্যন্ত উন্নত। তাই ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে ১৯০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভেলানগর গ্রামের হাইকোর্টের আইনজীবী স্বর্গীয় উপেন্দ্র কুমার রায়, এম এ বি এল ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ১ম গ্রেডের বৃত্তিলাভ করেন। তিনি নবীনগর সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠাকালেও বেশ কয়েক একর জমি দান করেন। একই বছর কাঠালিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত লবচন্দ্র পালও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য স্কলারশিপ পান। স্বর্গীয় লবচন্দ্র পাল পরে কিছুকাল এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন এবং সর্বধর্মের প্রচারক হিসেবে সুপরিচিত হন। ১৯০৪ সালে ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৮ সালে বাঘাউড়া গ্রামের স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৭ম স্থান অর্জন করেন। এছাড়া দড়িকান্দি গ্রামের তাজুল ইসলাম ১৯৩৬ সালে, নবীনগরের ক্ষিরোদা চরণ রায় ১৯৩৯ সালে, মরিচাকান্দি গ্রামের মিজানুর রহমান ৭ম স্থানসহ দাউদকান্দির প্রফেসর সফিউল্লাহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

আলিয়াবাদ গ্রামের লন্ডন-প্রবাসী ডা. হামিদুল হকও (১৯৬৪ সালে) ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেন। নবীনগরের মাধব চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৫৫ সালে) ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১৩তম স্থান অর্জন করেন। ভোলাচং গ্রামের গৌরাঙ্গ চন্দ্র সূত্রধর (১৯৬০ সালে) ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৭ম স্থান লাভ করেন। মাঝিকাড়া গ্রামের খোরশেদ আহমেদ এসএসসি পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৭০ সালে সিকানিকা গ্রামের জহিরুল আলম (বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী) বাণিজ্য বিভাগে ১০ম স্থান লাভ করেন। ১৯৭২ সালে শ্রীরামপুর গ্রামের ড. আবু নাসের খোন্দকার (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী) ১৩তম স্থান লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে কৃষি গ্রুপে মো. মুশফিকুল আলম ২য় স্থান অর্জন করেন। এ বিদ্যালয়ের অসংখ্য কৃতি ছাত্র দেশেবিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে নিয়মিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হতো। ১৮৯৮ সালের ২৩শে এপ্রিল বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি বিষয়াদিসহ সার্বিক সমস্যার উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯১১ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়েবস্টার ।

স্কুলের শতবর্ষের ইতিহাসে সহস্র সুখস্মৃতির পাশাপাশি কিছু বেদনাবিধুর ঘটনাও রয়েছে। বিদ্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তারই একটি। ১৯০২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত ১টার দিকে নবীনগর হাই স্কুলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। যার ফলে পরের দিন নির্ধারিত পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যালয়ের বাঁশের তৈরি লম্বা খড়ের ঘরের ৪টি কক্ষ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই সাথে চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ও বেঞ্চসহ মোট ২৭টি আসবাবপত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদু মিয়া সাহেব নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্কুলের বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্রসহ একটি কক্ষকে অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করেন। বহু চেষ্টা করেও এই অগ্নিকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের পর বিদ্যালয়টিকে সাময়িকভাবে জমিদার বাড়িতে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯০২ সালের ১১ অক্টোবর বিদ্যালয়টি পুনরায় পূর্বস্থানে স্থানান্তরিত হয়। ভস্মীভূত স্কুলঘরের জায়গায় প্রথমে টিনের ঘর তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও পরে স্থায়ী নিরাপত্তার স্বার্থে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ৩০৭৯ টাকা ৪ আনা

ব্যয়ে পাকা স্কুলভবন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। পরে আরও ৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ১৯০৩ সালে বিদ্যালয়ের একতলা পাকা ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়।

এই বিদ্যালয়ে অনেক আগে থেকেই স্কাউট চালু ছিল। ১৯২৭ সালে তৎকালীন প্রধানশিক্ষক শ্রী যোগেশ গুপ্তের নেতৃত্বে সমগ্র জেলার প্রাচীনতম স্কাউট দলটি এই বিদ্যালয়ে খোলা হয়। তিনি ত্রিপুরা জেলা স্কাউটসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতার গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ স্কাউটস জাম্বুরিতে নবীনগর হাইস্কুলের স্কাউট দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ১৯৮৫ সাল থেকে বিদ্যালয়ে বিএনসিসি দল চালু রয়েছে। ১৯৮৭ সালে চালু হয়েছে কারিগরি শিক্ষা বিভাগ (ভোকেশনাল)।

একসময় এ বিদ্যালয়ে প্রাইমারি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য আলাদাভাবে গুরু ট্রেনিং (জিটি) কেন্দ্র ও নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল। ১৯৬৭ সালে এ স্কুলে উপজেলার প্রথম এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। তার অনেক আগে থেকেই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকদের নাম তালিকা ক্রমানুসারে উল্লেখ করছি: ভুবন মোহন সরকার (স্বল্পমেয়াদী কার্যকাল), প্যারীচরণ দাস, চন্দ্রকান্ত ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯/২ থেকে ৯/৮/১৯০৩), জ্ঞানদা প্রসাদ দাস, নীলকুমার চক্রবর্তী, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, খগেন্দ্র নাথ ঘোষ, তারক চন্দ্র চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, আবদুল হালিম, কেরামত আলী, আশরাফ আলী, মোঃ ওসমান গনি, মোঃ শামসুজ্জামান, সৈয়দ আহমেদ, আবুল হোসেন চৌধুরী, মোঃ শহীদুল হক, আবদুল করিম, মোঃ আবু মোছা (বর্তমান প্রধানশিক্ষক)। দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, দানশীল ব্যক্তি, এলাকার অভিভাবক সমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়েছে এ বিদ্যালয়টি।

সময় নিরবধি বয়ে যায়। কালের আবর্তে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। একসময় বিদ্যালয় ভবনটি E টাইপের ছিল। কিন্তু বর্তমানে ৩ তলা ভবন ২টি, ২ তলা ভবন ১টি, এক তলা ভবন ২টি, টিনশেড ভবন ১টি, অভিভাবক ছাউনিসহ বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ ইংরেজি U আকৃতিতে রূপ নিয়েছে। ২০২১ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকটিও নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের পেছনে শিক্ষক কর্মচারিদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা (বর্তমানে ১৬০০) বৃদ্ধির সাথে শিক্ষক-কর্মচারির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক ৩০ জন ও ৮ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন (২০২২ সালে)।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এ বিদ্যালয়ও আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় অংশ নিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ে তুলবে। আশা করি ঐতিহ্যের গৌরবে সুখ্যাতির সৌরভে দিনদিন সমৃদ্ধ হবে নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।

** ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে ৩ দিনব্যাপী বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকাটি প্রবন্ধলেখক সম্পাদনা করেন। সে সময় বিদ্যালয়ের বহু পুরনো নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি এ প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।*

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক (অব:), নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মুজিবের অবদান

তোফাজ্জল হোসেন তারা

৭-ই মার্চে শুনেছি ভাষণ
মুজিবের কণ্ঠের বাণী
রেসকোর্সে তা ধ্বনিত হল
আমরা সবাই জানি ।

বলেছিল মুজিব শুনেছে জাতি
করবে বাংলা স্বাধীন
রক্ত দিয়েছি আরো রক্ত দিব
রইবো না কেউ পরাধীন ।

বঙ্গবন্ধুর বিজয় দিবস
উড়াও বিজয় নিশান
হটিয়ে দাও পাক হানাদার
জ্বালিয়ে করো শ্মশান ।

জেল খেটেছি জুলুম হয়েছে
পরোয়া করিনি কারো
লাঠিসোটা বল্লম যা কিছু আছে
তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

কত যে বীর শহীদ হয়েছে
বুদ্ধিজীবীর বলিদান
বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আজ
মুজিবের অবদান।

ভাষা, মাটি ও মানবতার টানে মানুষের অন্তরে
'বাউনবাইরার কতা'

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

নিজ জেলার ঐতিহ্যের অন্যতম সম্পদ আঞ্চলিক কথা, প্রবাদ প্রবচন ও নজিরা। এগুলো জিইয়ে রাখতে, ভুলতে বসা এই আঞ্চলিক ভাষাকে আবার সবার মুখেমুখে ফিরিয়ে আনতে, আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, ছন্দ-কবিতা, গান, গল্প ও প্রবাদ-প্রবচনকে আধুনিক মাধ্যমে সবার সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতেই ২০১৩ সালের ৭ই আগস্ট জেলার কয়েকজন স্বপ্নবান মানুষের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করে "Brahmanbaria Native Language (বাউনবাইরার কতা)" নামক ফেসবুক ভিত্তিক ভার্চ্যুয়াল গ্রুপ। ভার্চ্যুয়াল এই গ্রুপে প্রবেশ করলেই মনে হবে এক টুকরো ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ধীরে ধীরে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে এটি প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জনের পরিবার। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রচুর ছড়া, কবিতা, প্রবাদ ও গল্প পোস্ট হতে থাকে। মুখচেনা নয় তবুও কত মানুষ আপন হয়ে গেলো এই গ্রুপের মাধ্যমে, তখন আর গ্রুপ নয় একটা পরিবার ভাবতে শুরু করি এই গ্রুপটাকে। গ্রুপ প্রতিষ্ঠার ৬ মাসের মধ্যেই আয়োজন করা হয় গ্রুপের প্রথম মিলনমেলা ও চা পার্টি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা আড্ডা সবকিছু চলে আঞ্চলিক ভাষায়। তারপর নিয়মিত গ্রুপ মিটিং ও আড্ডা চলতো। আমাদের মিটিংগুলো সাধারণত ফারুকী পার্কেই (অবকাশ) হতো। ফারুকী পার্কে অবস্থিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতিসৌধ স্থাপনের ইতিহাস সংগ্রহ করে একটি ইতিহাস ফলক স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। অনেক বই থেকে তথ্য নিয়ে, বহু মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংগ্রহ করে জেলাপ্রসাশকের অনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতিসৌধের সামনে একটি ইতিহাসফলক স্থাপন করা হয় এবং দুইজন বীরমুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এরপর থেকে গ্রুপে যুক্ত হতে থাকেন আরও অনেক স্বপ্নবান মানুষ। সেই স্বপ্নের উপর ভর করে শুরু হয় গ্রুপের উদ্যোগে নতুন নতুন সব সামাজিক, মানবিক ও সচেতনতামূলক কাজ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিম্নরূপ:

পথশিশুদের ঈদ উৎসবঃ ২০১৪ সালের ২৫ জুলাই পথশিশুদের ঈদ উৎসবের মাধ্যমে জেলার সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের নিয়ে ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করা হয়, যেখানে ৫০এর অধিক শিশুর মাঝে বিতরণ করা হয় ঈদের নতুন পোশাক।

প্রবীণদের ঈদিঃ ২০১৫ সালে ধারাবাহিক আয়োজন পথশিশুদের ঈদ উৎসবের পরিবর্তে ঈদুল ফিতরের আগে ২৭শে রমজান আয়োজন করা হয় "প্রবীণদের ঈদি" যেখানে সেমাই, চিনি, দুধসহ ৩০০ জন প্রবীণ নারী-পুরুষের মাঝে ঈদের নতুন শাড়ি, লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। যা এখন পর্যন্ত প্রতিবছর নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রজেক্ট স্বাবলম্বীঃ ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয় প্রবীণদের ঈদির পাশাপাশি প্রজেক্ট স্বাবলম্বী। যার মাধ্যমে অসহায় হতদরিদ্র মানুষজনকে আয়ের পথ সুগম করে স্বাবলম্বী করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়ে এখন অবধি প্রজেক্ট স্বাবলম্বীর মাধ্যমে প্রায় তিন শতাধিক কর্মহীন ও হতদরিদ্র পরিবারকে তাদের কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রিক্সা, ভ্যানগাড়ি, গরু (১টি), ছাগল (৪-৫টি), মুদি দোকানের রেফ্রিজারেটরসহ মালামাল, চায়ের দোকানসহ মালামাল, সেলাইমেশিন, যেকোন খুচরো ব্যবসায়ের পুঁজি ইত্যাদি দিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হয়ে আসছে।

প্রজেক্ট গৃহায়ণঃ প্রবীণদের ঈদি ও প্রজেক্ট স্বাবলম্বীর পাশাপাশি ২০১৯ সালে হাতে নেওয়া হয় গৃহায়ণ প্রজেক্টের। প্রথম প্রজেক্ট নেওয়া হয় সদর উপজেলার বাসুদেব ইউনিয়নের ঘাটিয়ারা গ্রামের হতদরিদ্র সহায়সম্বলহীন মানবেতর জীবনযাপনকারী

একটি প্রতিবন্ধী পরিবারকে তাদের থাকার জন্য নতুনঘর, রান্নাঘর, স্যানিটারি টয়লেট, বিটপাকা টিউবওয়েল, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য চারটি ছাগল ও নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন: প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বাউনবাইরার কতা'র উদ্যোগে "ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন"-এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরে শুরু করে পর্যায়ক্রমে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫টি সফল মেডিকেল ক্যাম্পেইন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। যেখানে প্রতিবার গড়ে ২০-২৫ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গড়ে প্রায় ২৫০০ জন রোগীকে সেবা দিয়েছেন। রোগীদের ব্যবস্থাপত্রের পাশাপাশি ইসিজি, ডায়বেটিস চেক, রক্তচাপ মাপা ও বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয়।

বন্যার্তদের সহায়তায় ত্রাণ তহবিল গঠন: ২০১৭ সালে দেশের উত্তরাঞ্চল যখন ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয় তখন জেলা পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে ত্রাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করি, যার মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা সমমূল্যের কাপড়, নগদ পঁচিশ হাজার টাকা, একহাজার পিস খাবার সেলাইন, জরুরি ঔষধপত্র জেলা পুলিশের ত্রাণ তহবিলে হস্তান্তর করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ: ২০১৮ সালের শুরুতেই দেশে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহের দাপটে যখন অসহায় মানুষের জীবনে অচলাবস্থা ঠিক সেই সময়ে আমরা দাঁড়াই জেলা সদরের ভাদুঘর গ্রামের ঋষিপাড়া এবং বিজয়নগর উপজেলার পত্তন ইউনিয়নের মাসোয়ারা গ্রামের শীতার্ত মানুষের পাশে। দুটি গ্রামে যথাক্রমে ৫০০ ও ৩০০টি করে কম্বল বিতরণ করা হয়।

প্রজেক্ট আহার: করোনা মহামারিতে যখন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের খেটে খাওয়া মানুষজন কর্মহীন হয়ে পড়ে, তখন তাদের পাশে দাঁড়ায় টিম বাউনবাইরার কতা। যে সকল পরিবার কারো কাছে হাত পাততে পারতো না কিন্তু কষ্টে ছিল তাদের খুঁজে বের করে তিন দফায় প্রায় ১২০০ পরিবারে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, তেলসহ প্রায় ২০ কেজি করে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

ফ্রি অক্সিজেন ব্যাংক: দেশে যখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়, তখন হাসপাতালগুলোতে ভয়াবহভাবে অক্সিজেন সংকট দেখা দেয়। সেই সংকটকালে বাউনবাইরার কতা টিম বসে থাকতে পারেনি। শুরু করে বাউনবাইরার কতা ফ্রি অক্সিজেন ব্যাংক কার্যক্রম। প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চারটি হটলাইন নাম্বার এবং ৭৪টি মেডিকেল অক্সিজেন সিলিন্ডারের সমন্বয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবচেয়ে বড় অক্সিজেন ব্যাংক ২৪ ঘন্টা সেবা দিতে থাকে। যারা সিলিন্ডার ব্যবহার করতে পারে না সেখানে আমাদের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী টিম নিজে বহন করে নিয়ে সিলিন্ডার সেটআপ করে দিয়ে এসেছে। নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় ৫০০ জন করোনা রোগীকে অক্সিজেন সেবা দিয়ে মানবতার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে টিম বাউনবাইরার কতা। এছাড়াও বাউনবাইরার কতা'র আছে নিজস্ব ব্লাড ডোনেশন ইউনিট। যখন যেখানে রক্তের প্রয়োজন বাউনবাইরার কতার সদস্যরা তা ব্যবস্থা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আসছে। জেলা প্রশাসন বিভিন্ন সামাজিক ও সমাজ সচেতনতামূলক কাজে বাউনবাইরার কতা টিমকে পেয়েছে সর্বাগ্রে। মাদক বিরোধী আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে র‍্যালি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ, রচনা প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, বনভোজন ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনেও আছে বাউনবাইরার কতা'র সমান অংশগ্রহণ।

গ্রুপের এতো বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল কৃতিত্ব গ্রুপের সদস্যদের। গ্রুপের প্রতিটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়, যার সিংহভাগ আসে গ্রুপের সম্মানিত সদস্য ও বিশেষ করে রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসী ভাই-বোনদের কাছ থেকে। আমরা যারা গ্রুপের পরিচালনা প্যানেলে আছি, শুধু চেষ্টা করি সম্মানিত সদস্যদের আর্থিক সহায়তা স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করতে। উল্লেখ্য যে গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা আমরা শুধুই মানবিক কাজে ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্নরকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গ্রুপ মিটিং, সামাজিক সচেতনতা ও জাতীয় দিবস পালনের খরচ এমনকি মানবিক কাজের আনুষঙ্গিক খরচগুলো গ্রুপের এডমিন ও মডারেটর প্যানেলের নিজস্ব অর্থায়নে হয়ে থাকে।

পরিশেষে অন্তরের গভীর থেকে ভালোবাসা তাদের জন্য, যাদের সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আঞ্চলিক ভাষা আবারো প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, যাদের কষ্টার্জিত অর্থের সহায়তায় কিছু মুখে হাসি ফুটেছে, কিছু অসহায় মানুষ তার দুবেলা আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে অথবা সামান্য চিকিৎসা নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছে।

সমাজ এবং অসহায় মানুষের পাশে থাকাই বাউনবাইরার কতার ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা। চলুক প্রাণের ভাষায় নতুন আশায় বাউনবাইরার কতা।

লেখক: এডমিন, বাউনবাইরার কতা

কাশীনাথপুরে চন্দ্রবিন্দুর উদ্যোগে
শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু হলো উদ্দীপনা পুরস্কার

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার কাশীনাথপুর চন্দ্রবিন্দু সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে এবং ক্রিসেন্ট হাসপাতালের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুরু হলো চন্দ্রবিন্দু-ক্রিসেন্ট হাসপাতাল উদ্দীপনা পুরস্কার প্রতিযোগিতা। ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আরিফ কসমেটিক, মোল্লা মটরস, জামান হেলথ কেয়ার, আলরাজি হাসপাতাল ও ফজলুল বারী একাডেমীর সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো ৮ নভেম্বর কাশীনাথপুর কলেজিয়েট স্কুলে। উদ্বোধন করেন শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আক্কাশ হোসেন।

এ আয়োজনে বৃহত্তর কাশীনাথপুরসহ এ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো কাশীনাথপুর আব্দুল লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পাইকরহাটি-শহীদনগর উচ্চ বিদ্যালয়, কাশীনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাশীনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল, কাশীনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজ এবং ফজলুল বারী একাডেমী।

চন্দ্রবিন্দু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মো. হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মডারেট করেন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমাদের সমাচার নিউজ পোর্টালের সম্পাদক, কাশীনাথপুর শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহবুব হোসেন।

শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য ও বইপড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সৈয়দপুর স্কুল এন্ড কলজ এবং পাইকার হাটি-শহীদনগর উচ্চ বিদ্যালয়। উভয় স্কুলের তিনজন করে শিক্ষার্থীর "প্রযুক্তি দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ" বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতে অনুষ্ঠান অনন্য মাত্রা পায়। চন্দ্রবিন্দু সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সহসভাপতি সৈয়দপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার শাহীনের সঞ্চালনায় কবিতা আবৃত্তি, বইপড়া ও বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারকমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাশীনাথপুর ডিজিটাল কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আক্কাশ হোসেন ও সাবেক উপাধ্যক্ষ মেকাইল হোসেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নাকালিয়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মফিদুল হোসেন শাহীন, কাশীনাথপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর করিম খান রুবেল। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রবিন্দু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিষদের সংগঠক তোফাজ্জল হোসেন তারা ও শেখ শাহীন প্রমুখ।

মুক্তপাঠাগার বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময়

মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

৩ থেকে ৬ নভেম্বর “মুক্তপাঠাগার বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময়, রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষাসুপারভাইজারদের পুরস্কার প্রদান এবং সাজনা ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক আলোচনা” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে। সিদীপের ৪২টি ব্রাঞ্চ থেকে আগত মোট ৪৪ জন শিক্ষসুপারভাইজারের ২টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২২ জন) এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তারা মুক্তপাঠাগার নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং এ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে মুক্তপাঠাগারের গুরুত্ব ও নানাদিক নিয়ে আলোকপাত করনে সিদীপের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা, সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য সালেহা বেগম, নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, সংস্থার পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মশালায় বইপড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন লেখক ও গবেষক মনজুর শামস। এরপর দলীয় আলোচনা পরিচালনা করেন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ফারহানা ইয়াসমিন। এ পর্বে শিক্ষাসুপারভাইজারগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিল্পনা নিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য তুলে ধরেন:

বর্তমান অবস্থা

১. বই পড়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের মননশীলতার বিকাশ ঘটছে।

২. পাঠাগার উন্মুক্ত হওয়াতে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. বই পড়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেবাইল আসক্তি কমছে বলে অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেছেন।

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই নিয়ে পড়ার পাশাপাশি বই দান করারও প্রবণতা

দেখা যাচ্ছে। ফলে বেশির ভাগ মুক্তপাঠাগারেই বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. পাঠাগার থেকে বই হারানোর ঘটনা খুবই সামান্য, বরং কোন কোন পাঠাগারে বই দ্বিগুণ হয়েছে।

৬. সমাজের বইপ্রেমী মানুষেরা বই দান করে মুক্তপাঠাগারকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

৭. মুক্তপাঠাগার স্থাপনের ফলে সিদীপের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিল্পনা

১. শিশুপাঠ্য বই থাকা প্রয়োজন যাতে পাঠাগারটি ছোটবড় সকলের উপযোগী হয়ে ওঠে।

২. পাঠাগারে গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক, ইতিহাস বিষয়ক বই আলাদা আলাদা তাকে রাখা প্রয়োজন।

৩. নিয়মিত ফলোআপ করে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

৪. এলাকার বইপ্রেমী লোকজনকে উৎসাহিত করে পাঠাগারের সাথে যুক্ত করা।

৫. মাঝেমাঝে মুক্তপাঠাগারের পাঠকদের নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সহযোগিতায় আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সেরাপাঠক নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান।

৬. মুক্তপাঠাগারকে দীর্ঘমেয়াদে চলমান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. সংস্থার পক্ষ থেকে পাঠাগারে বই উপহার দেয়া।

৮. মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে একটি সমৃদ্ধ ও আদর্শ পাঠাগার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজকর্ম হিসেবে মুক্তপাঠাগারের গুরুত্ব ও করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান, কবি সৈকত হাবিব এবং আমরা সবাই ফাউন্ডেশনের পরিচালক আমজাদ হোসেন অপু, সংস্থার গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস এবং শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। তাঁরা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সমাজে জ্ঞানচর্চার ও নৈতিক চেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে মন্তব্য করেন।

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ

সিদীপ ও নগদ-এর চুক্তি স্বাক্ষর

মাঠপর্যায়ে সঞ্চয় ও ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম আরো সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সিদীপ বাংলাদেশ ডাকবিভাগের ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠান নগদ-এর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ২০ অক্টোবর নগদ-এর সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিদীপের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক। এ সময় এই দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষাসুপারভাইজারদেরকে পুরস্কার প্রদান

প্রতি বছরের মত এবারও সংস্থার শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য "বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও এলাকায় একটি মুক্তপাঠাগার তৈরিতে আমার পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি রচনা-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিলো। অংশগ্রহণকারী শিক্ষাসুপারভাইজারদের পাঠানো রচনাসমূহ মূল্যায়ন করে ২২ জনকে বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। ৩ ও ৬ নভেম্বর প্রধান কার্যালয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

ক্রমিক	শিক্ষাসুপারভাইজারের নাম	শাখার নাম	এরিয়া	মন্তব্য
১	ফাহমিদা জেসমিন	বাঘা	রাজশাহী	প্রথম
২	আজমিরা খাতুন	গোপালপুর (লালপুর)	বড়াইগ্রাম	দ্বিতীয়
৩	মোরশিদা আক্তার	বারেরা	মোহনপুর	তৃতীয়
৪	রুবিনা আক্তার	বিটঘর	ধরখার	তৃতীয়
৫	মোসা. আফসানা আক্তার	সিদ্ধিরগঞ্জ	নবীগঞ্জ	সেরা
৬	মিতু আক্তার	চারগাছ	ধরখার	সেরা
৭	সুমি আক্তার	রাজাপুর	বড়াইগ্রাম	সেরা
৮	নাজমা আক্তার	চারগাছ	ধরখার	সেরা
৯	মোছা. সুমি খাতুন	বনপাড়া	বড়াইগ্রাম	সেরা
১০	মোছা. আমিনা খাতুন	পুঠিয়া	রাজশাহী	ভাল
১১	মোছা. সালমা আক্তার	সাচার	হাজীগঞ্জ	ভাল
১২	কানিজ ফাতেমা	মোদাফফরগঞ্জ	লাকসাম	ভাল
১৩	তাহামিনা আক্তার	সোনারগাঁ	সোনারগাঁ	ভাল
১৪	মোছা. পপি খাতুন	বালুচর	পাবনা	ভাল
১৫	মোছা. কাকলি খাতুন	দেবোত্তর	পাবনা	ভাল
১৬	মমতাজ আক্তার	নবীগঞ্জ	নবীগঞ্জ	ভাল
১৭	মোসা. কিসমোতারা খাতুন	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভাল
১৮	মোসা. রুনা আক্তার	বোর্ডবাজার	আশুলিয়া	ভাল
১৯	মোছা. মাফরোজা খাতুন	বাগাতিপাড়া	নাটোর	ভাল
২০	মোসা. তাহসিনা খাতুন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভাল
২১	শারমিন আক্তার	মদনগঞ্জ	নবীগঞ্জ	ভাল
২২	আছমা খানম	কাশিনাথপুর	শাহজাদপুর	ভাল

৩ ও ৬ নভেম্বর ২টি ব্যাচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন সিদীপের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা, সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য সালেহা বেগম, নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের এসোসিয়েট প্রফেসর মো. হাবিবুর রহমান, প্রকৃতি প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী কবি সৈকত হাবিব ও 'আমরা সবাই ফাউন্ডেশনের পরিচালক আমজাদ হোসেন অপু, সংস্থার পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) এস এ আহাদ, পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে বই উপহার

বই উপহার দিচ্ছেন কবি সৈকত হাবিব

বিভিন্ন প্রথিতযশা লেখক ও প্রকাশনী এ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে বই উপহার দেন। যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী বিজ্ঞানি ও লেখক আশরাফ আহমেদ আগামী থেকে প্রকাশিত তাঁর লেখা বিভিন্ন বইয়ের ২০০ কপি (লেখকের পক্ষ থেকে সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমান বইগুলো উপহার দেন), প্রকৃতি প্রকাশনীর কবি সৈকত হাবিব ২৫০টি বই, লেখক-গবেষক সালেহা বেগম তাঁর লেখা ছোটদের জন্য জীবনীগ্রন্থ, লেখক ও অনুবাদশিল্পী মনজুর শামস তাঁর লেখা কিছু বই মুক্তপাঠাগারকে উপহার দেন। উপহার হিসেবে বই গ্রহণ করেন সিদীপের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি ও ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া।

বই উপহার দিচ্ছেন লেখক-গবেষক সালেহা বেগম

লেখক আশরাফ আহমেদের পক্ষে বই উপহার দিচ্ছেন সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমান

নতুন ৩টি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

এ বছরে প্রতিষ্ঠিত ১২টি 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার'-এর সঙ্গে যোগ হলো আরও নতুন ৩টি মুক্তপাঠাগার। ১ নভেম্বর ২০২২এ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কসবা উপজেলার কুটিতে 'কুটি অটল বিহারী উচ্চবিদ্যালয়'-এ উদ্বোধন হয় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন, অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাসুপারভাইজার ও সিদীপ কুটি ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জে সিদীপ সোনারগাঁ শাখার আওতায় বৈদ্যেরবাজার নেকবর আলী মুন্সী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৫ নভেম্বর যাত্রা শুরু হয় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কামাল হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক, সোনারগাঁ জোনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. ইসহাক আলী, শাখা ব্যবস্থাপক ফজলুল হক ও মো. তারিকুল ইসলাম, শিক্ষাসুপারভাইজার তাহমিনা আক্তার এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম।

২৩ নভেম্বর নবীগঞ্জ এরিয়ার সিদ্ধিরগঞ্জ শাখার কর্ম এলাকায় সফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম, অন্য শিক্ষকবৃন্দ, সিদীপ নবীগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো. মোতালিব মিয়া, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. রেজাউল করিম ও মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং শিক্ষাসুপারভাইজার আফসানা আক্তার।

গুঞ্জন পাঠাগার: এক বিকল্প শিক্ষালয়!

শাহেরীন আরাফাত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আগেই এক পাঠাগারের খোঁজ পাই। তবে সুযোগ হচ্ছিল না বলে যাওয়াও হচ্ছিল না। সম্প্রতি একটি দিন কাটিয়ে এলাম সেই পাঠাগার ও উদ্দীপ্ত কিছু মানুষের সঙ্গে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার এক গ্রামে পাঠাগারটির অবস্থান। গ্রামটির নাম 'সুহাতা'। জেলা সদর থেকে নদীপথে স্পিডবোটে নবীনগর যেতে সময় লাগে প্রায় ২৫ মিনিট। সড়কপথ বন্ধ থাকায় সে পথেই রওনা দিলাম। নবীনগর নেমে আরও প্রায় আধ ঘন্টা যেতে হয় রিকশা বা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায়। সবুজের আচ্ছাদনে সমৃদ্ধ এক গ্রাম সুহাতা। তবে গ্রামটি শিক্ষা-দীক্ষায় এক ভিন্ন খ্যাতি অর্জন করেছে। যা এক যুগ আগেও অনেকটা অকল্পনীয় ছিল। আর সে স্বপ্নের বীজ বোনা হয় প্রায় ১৮ বছর আগে, যখন 'গুঞ্জন পাঠাগার' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন এক 'বইপাগল' মানুষ- তাঁর নাম হাবিবুর রহমান স্বপন। গ্রামে কেউ ডাকেন স্বপন মিয়া, কেউবা স্বপন স্যার। তবে 'বইমজুর' হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি ভালোবাসেন। সারা জীবন বইয়ের জন্য কামলা খাটতে চান। এলাকায় ঘুরে ঘুরে বই সংগ্রহ, পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সপ্তাহ শেষে ফেরত আনা- এই মজুরিতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। নিজের স্বার্থে যেন কিছুই নেই। সবটুকুতেই যেন গুঞ্জন আর বইয়ের যুগলবন্দি।

স্বপন মিয়ার সঙ্গে তখনই যে প্রথম দেখা, তা তাঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝার উপায় নেই। তিনি যেন মন খারাপ করতে জানেন না। সবসময় মুখে লেগে আছে এক অমলিন হাসি। নিজের বাড়ির যেটুকু অংশ ভাগে পেয়েছেন, সেখানেই গুঞ্জনের ঠিকানা। সেখানে বসেই কথা হচ্ছিল স্বপন মিয়ার সঙ্গে। গুঞ্জন নিয়ে বলার সময় তাঁর চোখ দুটো ছলছল করছিল। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় গুঞ্জন আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো টিউশনির টাকা জমিয়ে, কখনো বা চা-সিগারেট বিক্রি করে, এমনকি রিকশা চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি এ পাঠাগারের জীবনীশক্তি দিয়েছেন।

স্বপন জানান, ছোটবেলায় বই পড়ার প্রবল ইচ্ছা ছিলো তাঁর; কিন্তু পড়ার জন্যে বই পেতেন না। বই কিনতে পারতেন না। অন্যের কাছ থেকে বই এনে পড়তেন। তখন মনে হয়েছে- তাঁর মতো অনেক গরীব মানুষ আছে, যারা ইচ্ছা থাকলেও বই পড়তে পারেন না। সেই চিন্তা থেকেই পাঠাগার গড়ার পথে যাত্রা শুরু।

মাত্র তিনটি বই আর একটি বাঁশের তাক বানিয়ে ২০০৪ সালের ৩০ মার্চ যাত্রা শুরু করে স্বপনের 'গুঞ্জন পাঠাগার'। গ্রামের এক বোনকে ভাবী সাজিয়ে এনজিও থেকে ৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দিয়েছিলেন টিনের চালা। জীর্ণ ঘরের পাশে উঠোনের এককোণে ছিল গুঞ্জন। শুরু থেকেই সেখানে রয়েছে সবার প্রবেশাধিকার। যেন উদাত্ত কণ্ঠে জ্ঞানার্জনের আহ্বান জানাচ্ছে। ১৮ বছরের যাত্রায় এখন বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। এক চালা, দুই চালা পেরিয়ে দ্বি-তল ভবনে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে 'গুঞ্জন পাঠাগার'।

মাত্র দেড় বছর বয়সে বাবাকে হারান স্বপন। তাঁর বাবা হারুন মিয়া ছিলেন পশু চিকিৎসক। বাবার মৃত্যুর পর তিন সন্তানকে নিয়ে অকূল সাগরে পড়েন মা রাজিয়া খাতুন। তাদের লালন-পালনে রাস্তার মাটি কাটার কাজ শুরু করেন। সংসারের অভাব মেটাতে স্বপনের বড় দুই ভাই রিকশা চালাতে শুরু করেন। এমন বাস্তবতাতেও স্বপন বইয়ের মাঝেই নিজেকে খুঁজে ফেরেন।

প্রথমে এলাকায় ঘুরে ঘুরে বই সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এরপর তা পাঠকের নিকট পৌঁছানো, সপ্তাহ শেষে ফেরত আনা- এসব কাজ করতে থাকেন। অনেকে নিরুৎসাহিত করেছেন, তীর্যক সমালোচনায় বিদীর্ণ করেছেন। তবু স্বপনের এই কাজ বন্ধ থাকেনি । স্বপন জানান, পাঠাগারের জন্য ২০০৭ সালে ভেঙে যায় তাঁদের পরিবার। পৃথক হন দুই ভাই। মা, খালা, নানীসহ ছয় জনের দায়িত্ব পড়ে স্বপনের কাঁধে। অর্থাভাবে দুইবার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে পড়ে। স্বপন তখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার্থী। টিউশন থেকে আয় দেড় হাজার টাকায় পরিবারের ভরণ পোষণের পাশাপাশি চলে লেখাপড়া ও পাঠাগার। জীবিকার তাগিদে দিন মজুর, মাইকিং, হকারের কাজও করেছেন স্বপন। তবুও দমে যাননি। ২০০৯ সালে পাঠাগারটি দু'চালা করে দেন তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরে নবীনগর পৌর মেয়রের উদ্যোগে শুরু হয় পাঠাগারটির দ্বিতল ভবনের কাজ।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করার পর স্বপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে সম্পন্ন করেছেন। লেখালেখিতেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন স্বপন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা ও সম্পাদিত সাতটি গ্রন্থ। চাঁদপুরে একটি কলেজে চাকরি হয়েছিল; কিন্তু তিনি সেদিকে যাননি। কারণ তিনি পাশে না থাকলে গুঞ্জন যে অসহায় হয়ে পড়বে। তিনি এখন পাশের একটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। সেখানেই থাকেন; কিন্তু গুঞ্জনের তদারকিতে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে তা নিয়ে স্বপনের চিন্তার শেষ নেই!

স্বপন বলেন, 'প্রথমে অনেকে নিরুৎসাহিত ও অবহেলা করলেও সবাই এখন পাঠাগারমুখী। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চলে পাঠাগারের কাজ।' তাঁর কথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। যখন বিকেল ৩টা ছুঁই ছুঁই পাঠাগারে আসতে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী শিশু, কিশোর, তরুণের দল। স্কুলের শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেখা হচ্ছে। আর সে কাজে সহযোগিতা করছে বড় ক্লাসের শিক্ষার্থীরা। তাদের ছোট-বড় দুটি দলে ভাগ করে গান, কবিতা আবৃত্তি, কুইজের আয়োজন এক অভিনব শিখন পদ্ধতির জানান দেয়। এমন করে যদি প্রতিটা স্কুলে জ্ঞানচর্চার পথটা খোলা থাকত, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতাটা ভিন্ন হতো। স্কুল-কলেজ আর বই হয়ে উঠত শিক্ষার্থীদের জীবনের অংশ- যেখানে নম্বর আর চাকরির দৌড় নেই।

বই পাঠ ছাড়াও পাঠাগারটির রয়েছে সাপ্তাহিক পাঠচক্র, মাসিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, দারিদ্র ও মেধাবী সম্মাননা ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান কার্যক্রম। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যারিয়ার আড্ডা, বৃক্ষরোপণ, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ নানা কাজ হচ্ছে গুঞ্জনের ব্যানারে।

পাঠাগারে এখন শুধু সুহাতা গ্রামের পাঠকরাই আসেন না; আশপাশের গ্রামগুলো থেকেও এখানে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আসতে দেখা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এলাকায় এখন পড়াশোনার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশ বেড়েছে। এর পেছনে গুঞ্জনের অবদান অনস্বীকার্য। এই পাঠাগারের পাঠক ও স্বপন মিয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা এখন শুধু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেনই না, পড়াচ্ছেনও। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবীতে রয়েছেন অনেকে। তাঁদের সবাই জানেন এবং মানেনও- গুঞ্জন ও স্বপন মিয়া তাঁদের জীবনে নতুন আলোর সঞ্চার করেছেন।

প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের, সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবিরের মতো বরেণ্য অনেক মানুষ এসেছেন এই পাঠাগারে। পাঠাগারের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান।

স্বপন মিয়া বলেন, 'মায়ের পরে পাঠাগার আমার প্রথম ভালোবাসা। বিশ্বাস করি, পৃথিবীকে বদলে দিতে পরমাণু যুদ্ধ নয়, জ্ঞান যুদ্ধ দরকার। পাঠাগারের মাধ্যমে সারা বিশ্বে জ্ঞান যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চাই।'

যে পথে গুঞ্জনে গিয়েছিলাম, সে পথেই ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সময় যেন নিমেষেই চলে গেল! এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিল। স্পিডবোটে হাওয়ার ঝাপটায় বারবার মনে দোল খাচ্ছিল–যখন নতুন প্রজন্ম বইবিমুখ হয়ে পড়ছে, কিছু আলোকদীপ্ত মানুষ সে সময়েও বইয়ের দিকে নজর ফেরাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সব শেষ হয়ে যায়নি, সব শেষ হয়ে যায় না।

লেখক: সাংবাদিক

দুবাই ভ্রমণ

রাবেয়া নাজনীন

দুবাই আরব আমিরাতের সাতটি প্রদেশের মধ্যে একটি। এটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ তীরে আরব উপদ্বীপে অবস্থিত। ১৮৩৩ সাল থেকে দুবাই শাসন করে আসছে আল মাকতুম পরিবার। এ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর আমরা ১০ সহকর্মীসহ রওনা হলাম আনন্দ ভ্রমণে 'ইউএস বাংলা' বিমানে দুবাইয়ের পথে।

দুবাইতে দেখি বেলি ড্যান্স। যে চমক মনে থাকবে অনেক দিন তাহলো মাথায় তলোয়ার নিয়ে কতো কী যে করলেন সেই নারী। এরপর একটা ছেলে সুন্দর নাচছিল। সে তার পোশাকে রাখা নানা জিনিস নিয়ে কতো যে ক্যারিশমা দেখালেন। অন্ধকারে পোশাকের আলো ও নৃত্যশিল্পীর ঘূর্ণনের ছন্দ কী যে সৌন্দর্য ছড়াল! ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরতে থাকলেন টানা, যেন থামবেনই না। শেষে ফায়ার ড্যান্স। ভালো লাগছিল।

আমরা ১০ জন একদিন ঘুরতে বের হলাম। আমরা পাম জুমেরা (পাম জুমাইরা হচ্ছে কৃত্রিম দ্বীপ), বুর্জ আলআরব, জেআরবি ও দুবাই মেরিনা এলাকায় ঘুরলাম এবং দুবাইয়ের রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।

দুবাই মল থেকে বের হলে দুবাই ফাউন্টেন দেখা যায়। বিকেলের দিকে ঐটা প্রতি ২০ মিনিট পর পর চালু করা হয় ৩-৫ মিনিটের জন্য। গানের সাথে সাথে পানির নাচ, সাথে লাইটিং। কি সুন্দর দেখায়। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফাউন্টেন। বুর্জ খলিফার পেছনের দিক দিয়ে এই ফাউন্টেন। বুর্জ খলিফার সামনেও ছোট কিছু সুন্দর ফাউন্টেন আছে। দুবাই মলের ভেতরে আছে একুরিয়াম এবং আন্ডারওয়াটার জু। বুর্জ খলিফার কাছাকাছি গিয়ে উপরের দিকে তাকালে মনে হবে যেন কাত হয়ে আছে।

আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ দুবাইয়ের Sheikh Zayed Grand Mosque। এটি দেখতে প্রচুর মানুষ আসে। দেখার মত একটা মসজিদ। যে কোন ধর্মের লোকই দেখতে পারে এই মসজিদ। মেয়েরা যারা বোরকা না পরে আসে তাদের জন্য বোরকার ব্যবস্থা আছে। এর পরের স্পট ছিল হেরিটেজ ভিলেজ। যেখানে আজ থেকে ৫০ বছর আগের এই অঞ্চলের মানুষ যেভাবে থাকত, তাদের ঘরবাড়ি যেমন ছিল তেমন কিছু ঘর আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ৫০ বছর আগের দুবাই বা আবুধাবি এত উন্নত ছিল না। তেলের খনি আবিষ্কারের পর থেকে এই অঞ্চলের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অল্প কয়েক বছরেই এসব অঞ্চলে আধুনিক শহর গড়ে উঠে। দুবাইয়ে সারা রাত মার্কেট খোলা থাকে।

দুবাই শহর অনেক সুন্দর। সবই কৃত্রিম, তারপরও সুন্দর। ঘুরার মত অনেক কিছুই রয়েছে। আমাদের ভ্রমণে অনেক অনেক আনন্দ হয়েছে।

লেখক: সহকারি ব্যবস্থাপক (ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস), সিদীপ

পাড়াগ্রামের ফুলজান ও আব্দুল জলিলের সফলতার গল্প

কিশোর কুমার

ফুলজান বেগমের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত । যদিও ৬০ শতাংশ জমি আছে, কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতনা। তাই স্বামী প্রায় সারাবছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে এবং অল্প কিছু দিন নিজের জমিতে কাজ করে। তবে কাজ না থাকা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রতিদিন কাজ করতে পারে না। এভাবেই চলে ফুলজান ও আব্দুল জলিলের সংসার।

ফুলজান বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ ছেলে ও ২ মেয়েসহ ৭ জন। দরিদ্রতার কারণে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না। একপর্যায়ে পাড়া প্রতিবেশীর নিকট থেকে ফুলজান বেগম জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতিমাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ প্ররিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি ফুলজান বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজস্ব জমিতে এবং আরও কিছু জমি বর্গা নিয়ে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে ফুলজান বেগম তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্ত্রীর কথায় আব্দুল জলিল সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর ফুলজান বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের পাড়াগ্রাম ব্রাঞ্চের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর সবজি চাষ প্রকল্পে ৬০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয়

এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ৬ মাসে ফুলজান বেগম তার সবজি ক্ষেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৩০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ৩০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন এবং ফুলজান বেগমের স্বামী শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন।

ফুলজান বেগম ২০১৮ সালে গাভী পালন প্রকল্পে ৩০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে ফুলজান বেগমের খামারে ৩টি গাভী রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি একই বছরে আবার ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন টমেটো চাষ প্রকল্পে। টমেটো চাষ করে আব্দুল জলিল ১৮,০০০ টাকা লাভবান হন। তখন তিনি ভালোভাবে বুঝতে পারেন এসএমএপি ঋণের অনেক সুবিধা। ২০২১ সালে ফুলজান বেগম আলু চাষ প্রকল্পে ৫০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন। এ প্রকল্পেও আব্দুল জলিল প্রায় ২২,০০০ টাকা লাভবান হন। তিনি সিদীপ অফিস থেকে কৃষি সম্পর্কিত নানাধরনের পরামর্শ পেয়ে থাকেন এবং পাশাপাশি তাকে উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষিকর্মকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তিনি উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ধানের প্রদর্শনী প্লট করার জন্য কিছু বীজ ও সার পেয়েছিলেন। ২০২২ সালে ফুলজান বেগম আবারও ৫০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেছেন। এ টাকার সাথে তিনি আরও কিছু টাকা যোগ করে একটি পাওয়ারটিলার ক্রয় করেছেন। পাওয়ার টিলার ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি সিদীপ অফিস থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছেন। বর্তমানে আব্দুল জলিল ও ফুলজান বেগমের ২টি পাওয়ারটিলার রয়েছে। এ থেকে তিনি বর্তমানে গড়ে প্রতিমাসে ২৫,০০০ টাকা উপার্জন করছেন।

ফুলজান বেগম এসএমএপি ঋণ গ্রহণের পূর্বে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষিকর্মকর্তার সাথে পরিচয় হয়। ৬০ শতাংশ জমির মধ্যে ৪০ শতাংশ জমিতে তিনি চক্রাকার পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন যেন সবসময় তার সবজি ক্ষেত থেকে সবজি বিক্রয় করতে পারেন এবং বাকী ২০ শতাংশ জমিতে ধানচাষ করেন। ২০ শতাংশ জমিতে নেপিয়া ও ভুট্টাচাষ করেন। ৪০ শতাংশ জমিতে আলু চাষ করেন। বর্তমানে ফুলজান বেগম তার সবজি ক্ষেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪,৫০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন যা থেকে লাভ হয় প্রায় ১,৫০০ টাকা। এছাড়া তার ফসলের অবস্থাও ভাল এবং সবসময় এই ফসলের কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা সিদীপ ও কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ করে জানেন। ফুলজান বেগম বলেন এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমিচাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রয় করে প্রায় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। ফুলজান বেগম ও তার স্বামী আব্দুল জলিল জানান ধান চাষ করে এক মৌসুমে প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। তিনি সবজি চাষের পাশাপাশি গাভী পালনে আগ্রহী হন এবং একটি গাভী ক্রয় করেন। চার বছর থেকে তিনি এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করছেন। তার এ সকল কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য সকল মানুষ কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহ পেয়েছেন, তার সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করছেন। তাদের উন্নতির জন্য আব্দুল জলিল ও ফুলজান বেগম সিদীপের প্রতি সবসময়ই অনেক আন্তরিক ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লেখক: সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

বিজয়োৎসব-২০২২

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো বিজয়োৎসব ২০২২। অনুষ্ঠানে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান ভুঁইয়া তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ করেন ও স্বাধীন বাংলাদেশে উন্নয়নকর্মীদের ভূমিকা উল্লেখ করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা বিজয় দিবসে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নকর্মী হিসাবে দেশ গঠনে ভূমিকা পালন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

এদিনে প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত বিজয় দিবস টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেয়া হয়। টুর্নামেন্টে সিংগেলসে চ্যাম্পিয়ন হন সাব্বির রায়হান এবং রানার-আপ হন সতেজ চাকমা। ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হন ডা. আইদিদ হাসান ও মো. ইকবাল হোসেন এবং রানার-আপ হন এস এম শাহরিয়ার ও সতেজ চাকমা।

এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষে গণযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান আইআরসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রকাশনা সংস্থা শিলালিপির প্রকাশক ও প্রধান নির্বাহী জনাব জাহিদুল ইসলাম তাদের প্রকাশনী সংস্থা শিলালিপি থেকে প্রকাশিত ১৫০টি বই 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে' উপহার দেন। সংস্থার পক্ষ থেকে বই গ্রহণ করেন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, পরিচালক (ফিন্যান্স এণ্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আব্দুল আহাদ, পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স-প্রোগ্রাম) জনাব এ.কে.এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ, জিএম (ফাইন্যান্স এণ্ড একাউন্টস) জনাব এ.কে.এম. শামসুর রহমান, মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব মো. ইব্রাহিম মিঞা। এছাড়াও গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের সঞ্চালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন মন্‌জুর শামস, মাহবুব উল আলম, মিঠুন দেব ও শারমিন সুলতানা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মো. তাওহীদুন্নবী, মন্‌জুর শামস , জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নুরুন্নাহার নিশি, মাহমুদুর রশীদ অরিস, আহসান হাবীব জয়, ডা. আইদিদ হাসান, মাহবুব উল আলম ও শারমিন সুলতানা। এতে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে

সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার

দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (পিইউবি) সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমান দেশে সমাজকর্মের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করছেন। তিনি কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক প্র্যাকটিসেস এন্ড ডেভেলপমেন্টের (CSWPD) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর উদ্যোগে বাংলাদেশে গত আট বছর ধরে 'বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস' (WSWD) পালিত হয়ে আসছে। এছাড়া 'বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস' উপলক্ষে ঢাকায় পরপর পাঁচবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে যেখানে ডব্লিউএসডব্লিউডি-এর মূল প্রতিপাদ্যকে ঘিরে পৃথিবীর বহু দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন সিএসডব্লিউপিডি-র একটি চলমান উদ্যোগ। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের শক্তি ও দুর্বলতাকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজের সমস্যাসমূহের গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সুস্থ সুন্দর মানবিক সমাজগঠনে সমাজকর্মী হাবিবুর রহমান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' ছোটকাগজের সম্পাদক লেখক আলমগীর খানের সঙ্গে পিইউবি-তে তাঁর বিভাগের কার্যালয়ে সমাজকর্মের নানাদিক নিয়ে সম্প্রতি তাঁর এক আলাপচারিতা হয়, যা এখানে তুলে ধরা হলো।

প্র: আপনি নিজেকে সমাজকর্মী বলে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করেন এবং সমাজকর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রস্বীকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চান। অথচ আমাদের শিশুরা সাধারণত জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্বপ্ন দেখে ডাক্তার, প্রকৌশলী বা গায়ক, অভিনয়শিল্পী ইত্যাদি হওয়ার। কিন্তু কারো সমাজকর্মী হওয়ার লক্ষ্যের কথা শোনা যায় না। কেন?

উ: শিশুরা বড় হয়ে সেইসব পেশার মানুষ হতে চায় যেগুলোতে আর্থিক নিরাপত্তা ও সামজিক মর্যাদা বেশি দেখা যায়। বাবামায়েরাও তাদেরকে তেমন পেশার মানুষ হতে উৎসাহিত করেন। আমরা আমাদের শিশুদের মনে সমাজকর্মের প্রতি ভালবাসা জন্মাতে পারিনি। তাদের সামনে সমাজকর্মীর কোনো মডেল নেই। যদি থাকতো তাহলে তারা সমাজকর্মীও হতে চাইতো। কেননা তারা দেখতো যে, শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ভাল মানুষ তৈরি করা। আর ভাল মানুষ হতে যেসব গুণাবলী দরকার একজন সমাজকর্মীর মধ্যে তার সবগুলোই থাকতে হয়।

প্র: আমাদের দেশের অনেক মানুষই বিভিন্ন রকম সমাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আবার বিভিন্ন পেশার মানুষই নিজেদের মত করে কিছু না কিছু সমাজের কাজ করে থাকে। অনেকদিন আগে থেকেই সমাজকর্মের এই ইতিহাস আমাদের দেশে আছে। তাহলে সমাজকর্মকে আপনি একটা আলাদা পেশা হিসেবে দেখতে চান কেন?

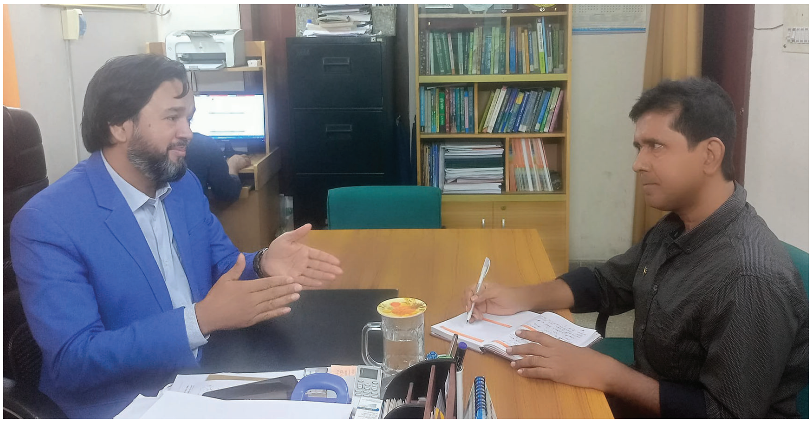

উ: এটা ঠিক যে নানাভাবে আমাদের দেশে সমাজকর্ম হচ্ছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের অন্যান্য কাজের অংশ হিসেবে এটি করছে। সমাজকর্মটা তাদের পেশার মাঝে বিল্ট-ইন। এটি তাদের মূল কাজ নয়। কিন্তু উন্নত দেশে মানুষ সমাজকর্মকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের মত স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেখানে সমাজকর্মের ব্যাপক ক্ষেত্র আছে।

প্র: আমাদের দেশে সমাজকর্ম পেশা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী কী?

উ: কোনো কাজ পেশা হতে গেলে তা পঞ্চাশ শতাংশ অ্যাকাডেমিক ও পঞ্চাশ শতাংশ প্রায়োগিক হতে হয়। চিকিৎসাসহ বিভিন্ন পেশায় পড়ালেখা শেষে শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষানবিশি করতে হয়। এটি সমাজকর্মেও থাকা দরকার। পেশা হতে হলে একজন সমাজকর্মীকে এখান থেকে আয় করতে হবে। তার জন্য শিক্ষাগত ভিত্তি ও আইনগত বৈধতা থাকতে হবে। আমাদের দেশে এসব অনুপস্থিত। আমাদের দেশে সমাজকর্মীদের জাতীয় পর্যায়ের কোনো পেশাজীবী সংস্থা নেই, যেমন ইংল্যান্ডে আছে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব সোশাল ওয়ার্কারস। পঞ্চাশের দশকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজকর্ম বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষাদান শুরু হয়। এখন এটি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ানো হচ্ছে। সরকারি নেতৃত্বে সমাজকর্মীদের একটি জাতীয় পর্যায়ের সংস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়াও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্র: এজন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

উ: সমাজকর্ম বিষয় হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভিত্তিক। আমাদের প্রচলিত সমাজকর্ম মূলত সহানুভূতি ও ব্যক্তিগত সদিচ্ছা নির্ভর, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চর্চা নির্ভর নয়। আমাদের দেশে যারা সমাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত যেমন এনজিওরা তাদের উচিৎ হবে সমাজকর্মে পড়ালেখা করা ছেলেমেয়েদেরকে বেশি করে চাকরিতে নিয়োগ দেয়া। এছাড়া বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য সমাজকর্ম নিয়ে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমাজকর্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, তাদের কর্মীদের জন্যও সমাজকর্ম বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায় যাতে তাদের কাজ থেকে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। প্রায় সব পেশার সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে সমাজকর্ম জড়িত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্কুল, হাসপাতাল সবক্ষেত্রেই সমাজকর্মের ভূমিকা রয়েছে। রানা প্লাজা, তাজরিন ফ্যাশনের মত পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে বড় বড় দুর্ঘটনার পর সুযোগ থাকলে পেশাদার সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো।

প্র: বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অনেক পেশার অস্তিত্ব হুমকির মুখে। তথ্যপ্রযুক্তি অনেক পেশায় নানারকম পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এই পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সমাজকর্ম কোথায় অবস্থান করছে?

উ: বিশ্বায়ন নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসছে ও বিদ্যমান সমস্যায় নতুন মাত্রাও যোগ করছে। এ পরিস্থিতিতে সমাজকর্ম আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। যেমন দেখুন, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশাল ওয়ার্কার্সের (আইএফএসডব্লিউ) নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে সেখানকার সমাজকর্মীরা মূল্যবান সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

প্র: আমাদের দেশে সমাজকর্মের ভবিষ্যৎ কী?

উ: বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের পথে। অনেক মানুষ এখন শিক্ষা গ্রহণ করছে ও তারা চাকরির বাজারে আসছে। এরফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে। প্রতিদিনের জীবনযাপনে নতুন নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হবে। সেইসঙ্গে সমস্যার বহুমুখীকরণ ঘটবে। আবার মানুষ এসব সমাধানে বেশি মনোযোগীও হতে পারবে। উন্নত দেশের মানুষেরা তো এখন ক্ষুধার্ত নয়, কিন্তু তারা নানা মনোসামাজিক সমস্যায় ভুগছে। একইভাবে এখানেও ব্যক্তিগত ও মানসিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে আর তা হবে প্রধানত পরামর্শমূলক, কাউন্সেলিং টাইপের। এই অবস্থায় আগামী দিনে আমাদের পাশে সমাজকর্মী দরকার হবে প্রতিদিন। তাই এখনই বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশাদারি মর্যাদা পাক–এই আমার স্বপ্ন।

প্র: সিদীপ তার বিভিন্ন কর্ম-এলাকায় অবস্থিত স্কুলকলেজে একটি বিশেষ ধরনের পাঠাগার স্থাপনের উদ্যাগ গ্রহণ করেছে যেখানে মূলত এলাকার বইপ্রেমীদের কাছ থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে স্কুলকলেজের দেয়ালে একটি বুকশেলফে রেখে দেয়া হয়। এখান থেকে যে কেউ ইচ্ছেমত বই নিয়ে যেতে পারেন ও পড়া শেষ করে সুবিধামত ফেরত দিয়ে যেতে পারেন। আমরা একে বলি 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার'। সিদীপের এই মুক্তপাঠাগারকে সমাজকর্ম হিসেবে আপনি কীভাবে মূল্যায়ণ করবেন?

উ: মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার একটি যথার্থ সমাজকর্ম। মানুষের মাঝে জ্ঞান বিস্তারের জন্য কাজ আসলে সবচেয়ে বড় সমাজকর্ম। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, সিদীপের এ উদ্যোগ সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

বই-আলোচনা

গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা

ফজলুল বারি

মনজুর শামসের লেখা "গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা" বইটি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গেল আশির দশকে পড়া একটি বইয়ের কথা। সে বইটির নাম Doctor to the Barrios, লেখক ছিলেন ফিলিপাইনের অধিবাসী। ফিলিপাইনে গ্রামকে ইংরেজিতে বলা হয় Barrio। বইটির লেখক জোয়া ফ্লেভিয়ার (Juan Flavier)। তিনি পেশায় একজন ডাক্তার। ডাক্তার হয়েও তিনি চাকরি নিয়েছিলেন ম্যানিলায় অবস্থিত International Institute for Rural Reconstruction (IIRR) নামক একটি প্রতিষ্ঠানে। জড়িয়ে পড়েছিলেন গ্রাম উন্নয়নে, গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবায়। এতটাই প্রশংসিত কাজ করছিলেন যে তাঁর ডাক পড়তে থাকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি বইটি লেখেন। ডাক্তার হয়ে গ্রামীণ জনগণের জন্য সেবায় নিবেদিত কাজের বর্ণনামূলক চমৎকার একটি বই এটি। এক নিশ্বাসে পড়ার মতো। মনজুর শামসও অনেকটা তাই। পেশায় একজন সাংবাদিক। ঘটনাচক্রে এক বন্ধুর কাছে গল্প শোনেন শিশুশিক্ষার একটি অভিনব প্রচেষ্টার। মনের কোণে জমিয়ে রাখা একটি সুপ্ত ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পান সেই প্রচেষ্টার মাঝে। এ কথা তিনি নিজেই লিখেছেন 'সন্ধান পর্ব' নামে বইটির প্রথম নিবন্ধে ।

বইটি নিয়ে আলোচনার আগে এখানে একটু বলে নিই কী ছিল সেই প্রচেষ্টা। সেই যে আপেল ফলটি গাছ থেকে ঝরে পড়ার সময় উপরে না উঠে নিচে কেন পড়ল–তেমনই একটি বিষয়। প্রাইমারি স্কুলের ছেলেটি ক্লাসে যোগ না দিয়ে কেন স্কুলের পেছনে লুকিয়ে খেলতে গেল তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিদীপের কর্ণধার, সমাজবিজ্ঞানমনস্ক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া চালু করলেন স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধকল্পে 'শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি' (শিসক)। শিসক খুবই সাধারণ একটি

ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র পরিবারে বাড়িতে পড়া শিখিয়ে দেয়ার কেউ নেই, তাই পড়া তৈরি করতে না পারায় শিক্ষকের পিটুনির ভয়ে ক্লাস থেকে পালিয়ে বেড়ানো। এমন একটি সমস্যার সমাধানে ভাবনায় এলো, গ্রামের একজন মহিলা এ দায়িত্ব নিলে কেমন হয়? ব্যাস, এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শুরু হলো অসাধারণ কর্মযজ্ঞ। শিসকের এই অন্তর্নিহিত ধারণা, এর কার্যক্রম, পরিচালনা, শিশুদের অংশগ্রহণ, শিক্ষিকাদের ভূমিকা, অভিভাবকদের আগ্রহ ইত্যাদি সকল কিছু শুনে, বুঝে এবং গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরেজমিনে দেখে মনজুর শামস তাঁর সাংবাদিক পেশার সবটুকু ঢেলে দিলেন। শিসকের সকল খুঁটিনাটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ৩৯টি নিবন্ধের সংকলন নিয়ে লিখলেন এই বই।

সবগুলো নিবন্ধই শিসক সম্পর্কিত। তবে বইটির শুরুর দিকে শিশুশিক্ষার একটি তথ্যবহুল কিন্তু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক 'শিশু শিক্ষা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' নিবন্ধে। সেই আদি বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মোগল, ইংরেজ আমল হয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি চমৎকার বর্ণনা পাবেন পাঠকবৃন্দ। এ বর্ণনার শেষদিকে জানা যায় যে, ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাস করা হয়। ২০১৮ সালের তথ্য অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৯৭.৯৪%। কিন্তু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ছিল ২০০৫ সালে ৪৭.২% এবং ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৮.৮%। লেখক তার 'ঝরে পড়া রোধে অনন্য সাফল্য' (পৃষ্ঠা ৩৮) নিবন্ধে দাবি করেন যে কমে যাওয়ার এই অগ্রগতিতে সিদীপের অবশ্যই কিছুটা অবদান আছে। শিশুশিক্ষার এই ইতিহাস বর্ণনার পর লেখক বাকি সবগুলো নিবন্ধই লিখেছেন শিসক নিয়ে।

শিসকের একজন শিক্ষিকা, যিনি নামমাত্র সম্মানির বিনিময়ে কাজ করেন, তাঁর কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন তাঁকে কত ধরনের কাজই না করতে হয়! শিক্ষার্থী সংগ্রহ, কোথায়, কীভাবে পড়াবেন, তাদের বসার ব্যবস্থা, পাঠদানের সময়সূচি, শিশুদের যত্ন নেয়া, শিশুদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, অভিভাবক ও পাড়ার মুরুব্বিদের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করাসহ নানা ধরনের কাজ তাঁকে একাই সামলাতে হয়। শিক্ষাদানের বাইরেও একজন শিক্ষিকাকে আরও অনেক কাজ করতে হয়, যার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন 'একজন শিক্ষিকা কেবল একজন শিক্ষিকাই নন' নিবন্ধ (পৃষ্ঠা ৫১)। শিক্ষা সুপারভাইজার, যারা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও সাহায্যতা প্রদান করে থাকেন, তাদের কথা লিখেছেন পরবর্তী নিবন্ধে।

শিসক কিভাবে তার কাজের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, কী তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কর্মধারা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় লেখক তুলে ধরেছেন 'শিসকের প্রাথমিক পর্যায়' নিবন্ধে। কেননা শিসকের কোনো পূর্ব-কাঠামো ছিল না, কিংবা এটি কোনো বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবনাও নয়–যা ঐ কাঠামো অনুযায়ী সাধারণত বাস্তবায়ন করা হয়। এটি একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা একটি কার্যক্রম, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক ছিল এবং তা পূরণের জন্য চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে তাকে গড়ে তোলা হয়। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে লেখক এ প্রচেষ্টার প্রথম ৫ বছরে (২০০৫-২০১০) যে সকল কাজ করা হয় তাকে প্রাথমিক পর্যায় বলে গণ্য করেছেন। এই সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতির বেশকিছু পরিসংখ্যানসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড–যেমন বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ আয়োজন, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের কথা লেখক তুলে ধরেছেন এই নিবন্ধে।

পরবর্তী ২০১১-২০১৪ সময়কালকে লেখক দ্বিতীয় পর্যায় বিবেচনা করেছেন। কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন ঐ সময়ে শিসকের ব্যাপ্তি সিদীপ ছাড়িয়ে অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে প্রায় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শিসক কার্যক্রমের বেশ কয়েকটি মূল্যায়ন পরিচালনা করে কয়েকটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দু'জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষকের লেখা Arresting primary school dropout, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত Does extra tuition matter in reducing primary school dropout ইত্যাদি। শিসকের একজন কর্মকর্তা ভারতের প্রতীচী ট্রাস্টের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ভারতের নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের হাতে তুলে দেন শিসকের ওপর ইংরেজিতে লেখা একটি বই। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী সরেজমিনে ঘুরে যান শিসকের কয়েকটি এলাকা। এ ছাড়া শিসক কার্যক্রমের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। ২০১৩ সালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি 'শিক্ষিকা সমাবেশ' করা হয় ঢাকায়, যেখানে

শিসক কিভাবে তার কাজের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, কী তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কর্মধারা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় লেখক তুলে ধরেছেন 'শিসকের প্রাথমিক পর্যায়' নিবন্ধে

১০০ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। এ সকল কিছুরই বর্ণনা আছে বইটির এ অংশে। শিসক সৃষ্টিকারী মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার একটি প্রবন্ধ 'মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীদের সামাজিক সহায়তা' শীর্ষক একটি লেখাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এখানে।

২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালকে শিসকের তৃতীয়/বর্তমান পর্যায় (বইটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে) আখ্যা দিয়ে লেখক বলেছেন প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে শিশুদের ক্লাসের পড়া শিখিয়ে দিয়ে শিসকের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল বলে বিবেচিত হলে সিদীপ এই কর্মসূচিতে যোগ করল শিশুর সার্বিক বিকাশে নানামাত্রিক শিক্ষামূলক আয়োজন। তাই শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা, যা কিছুটা আগেই শুরু হয়েছিল–তার সঙ্গে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রবর্তন করা হলো সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে এই আয়োজন শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের শুধু একটি আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানই নয়, এতে গরিব শিশুদের নানামুখী প্রতিভা প্রদর্শনের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নানা আয়োজনে শিশুরা মুখরিত করে তুলল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণকে। অনুষ্ঠান আয়োজনে ভিন্ন আরও একটি মাত্রা যোগ হলো, যখন 'প্রবীণ সংবর্ধনা' যুক্ত হল এর সঙ্গে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দেয়া হলো আনুষ্ঠানিক সম্মাননা। সমাজ অবক্ষয়ের এই সময়ে এ কার্যক্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করল অনেকেরই। ২০১৬-১৭ সালে আর একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলো শিসকের সাথে। এটি হলো 'প্রকৃতি-পাঠ'। শিশুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় এই পাঠ প্রদানের জন্য একটি নির্দেশিকা লেখা হলো। মনজুর শামসেরই লেখা শিক্ষিকাদের জন্য এ নির্দেশিকায় প্রকৃতি পাঠের শিখন পদ্ধতির ৪টি ধাপের বর্ণনা আছে। প্রকৃতি পাঠকে যথার্থভাবে তুলে ধরা ছড়াকার ও কবি সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটিও লেখক বইটিতে সংযোজন করে দিয়ে মূলত বইটি রচনা শেষ করেছেন। কিন্তু তার পরেও বইটিতে আরও কিছু বিষয় সংযোজন করেছেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিসকে কর্মরত কয়েকজন শিক্ষা সুপারভাইজার ও শিক্ষিকা, কয়েকজন সচেতন নাগরিক ও অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের অভিমত ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলায় লেখা কিছু প্রবন্ধের সংযোজন। সবশেষে বিশ্বের ব্যতিক্রমী কিছু শিশুশিক্ষার কার্যক্রমও তুলে ধরেছেন লেখক।

শিশুশিক্ষার ব্যাতিক্রমী একটি উদ্যোগ এবং এর সফলতা সম্পর্কে কেউ যদি জানতে চান তবে তার জন্য এই বইটি অবশ্যই মূল্যবান তথ্য দেবে। সুলিখিত, সুন্দর ছাপা এবং প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ছবি সংবলিত এ বইটি প্রকাশ করেছে দিব্যপ্রকাশ, ২০১৯ সালে। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন শিসকের সকল কর্মী, শিক্ষা সুপারভাইজার, শিক্ষিকা ও শিশু শিক্ষার্থীদের–যারা আগামীতে সৌরভ ছড়াবে বিশ্বময়। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পুনশ্চ : করোনাকালীন দুই বছর বন্ধ থাকার পর বর্তমানে ১৯ জেলার ১০২টি উপজেলায় ২৭৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিসক পরিচালিত হচ্ছে।

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সংস্থার গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে সিদীপের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জনাব ফজলুল বারির সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও এরপর সংশোধিত বাজেট উত্থাপন ও অনুমোদনের পর নির্বাহী পরিচালক সংস্থার বার্ষিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে পরিচালনা পরিষদের সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

ওয়াশিংটন ডিসি বইমেলায়

‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’

২৯ ও ৩০ অক্টোবর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত হলো ডিসি বইমেলা ২০২২। মেলার প্রথম দিনে বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ ‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’ বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন: “মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আমার দৃষ্টিতে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। তিনি দেখালেন আমাদের নিজস্ব যে সম্পদ আছে সেটা দিয়েই আমরা এনজিও গঠন করতে পারি এবং গ্রামীণ সম্পদ দিয়ে শুরু করে সিদীপ নামে বিশাল এক এনজিও গড়ে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আমরা উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারি বিদেশি সাহায্য ছাড়াই। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া কতগুলো সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে উঠানস্কুল অন্যতম। তিনি প্রায় তিন হাজার উঠানস্কুল বাস্তবায়ন করেছেন গ্রামের প্রান্তিক শিশুদের জন্য, যা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে ভূমিকা রাখছে। এই বইটি পড়লে তাঁর সম্পর্কে জানা যাবে। তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। ...”